قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ "আপনি বলিয়া দিন হে বান্দাগণ! যাহারা নিজেদেরই ক্ষতিকর ত্রুটি করিয়াছ, তোমরা আল্লাহর রহমতের আশা ত্যাগ করিও না, নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ এই শ্রেণীর সব গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী দয়ালু .....। এই আয়াত লিপিযোগে মদীনা হইতে মক্কায় আইয়্যাশ ও হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট পৌঁছাইয়া তাঁহাদের সান্ত্বনার ব্যবস্থা করা হইল।

এদিকে নবীজী (সঃ) ঐ শ্রেণীর নির্যাতিত অসহায় মুসলমানগণের মুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা আরম্ভ করিলেন। এমনকি জামাতের সহিত ফরয নামাযের মধ্যেও সকলকে আমীন বলার সুযোগ দানে সশব্দে ঐ দোয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। মক্কায় আবদ্ধ অত্যাচারিত দুর্বল মুসলমানদের মুক্তির দোয়ায় কতিপয় বিশেষ নামও উল্লেখ করিতেন; তন্মধ্যে আলোচ্য আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম সর্বাগ্রে ছিল। দোয়ার মধ্যে আরও একজনের নাম ছিল– সালামা ইবনে হেশাম। তিনি ছিলেন আবু জহলের সহোদর। তিনিও ইসলাম গ্রহণের অপরাধে একই কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁহার পা আইয়্যাশের পায়ের সহিত শিকলে বাঁধা ছিল। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ–৪) দোয়ার বিস্তারিত বয়ান প্রথম খণ্ড ৫৪৭ নং হাদীছে রহিয়াছে।

আইয়াশ (রাঃ)-এর মুক্তিলাভ

নবী (সঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান মক্কায় কাফেরদের হস্তে বন্দী রহিয়াছেন বা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আটকা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম একই কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইতেছিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন–

مَنْ لِىْ بِعَيَّاشِ ابْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَهِشَامٍ ـ

অর্থ ঃ "আইয়্যাশ এবং হেশামের মুক্তির জন্য আমি উদ্‌গ্রীব; আমার এই বাসনা পূরণে আত্মদান করিতে কে প্রস্তুত আছ? ওলীদ নামক ছাহাবী বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। ওলীদ (রাঃ) মক্কায় আসিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন; কারাগারে বন্দীদের আহার তাঁহাদের বংশীয় লোকদের পৌঁছাইবার অনুমতি ছিল; সেমতে এক মহিলা খাদ্য নিয়া যাইতেছিল। ওলীদ (রাঃ) ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলিয়া জানিতে পারিলেন সে ঐ বন্দীদের জন্যই খাদ্য নিয়া যাইতেছে। ওলীদ (রাঃ) তাহার পিছনে পিছনে গেলেন এবং কারাগারের অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিলেন। কারাগারটি নগর প্রান্তে শুধু প্রাচীর বেষ্টিত ছিল– তাহার উপরে ছাদ ছিল না; বন্দীগণ সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সারা দিন সেই ছাদবিহীন কারাগারে ছটফট করিতেন। ওলীদ (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সেই কারাগারের নিকটে যাইয়া বহু কষ্টে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া লাফাইয়া কারাগারের ভিতরে পড়িলেন। কিন্তু বন্দীদের পায়ে কঠিন লৌহ বেড়ির বাঁধন ছিল; এই অবস্থায় তাঁহারা চলিতে সক্ষম হইবেন না, কিরূপে পলায়ন করিবেন? ওলীদ (রাঃ) এক খণ্ড শক্ত পাথর খুঁজিয়া আনিলেন এবং লৌহ বেড়ির নীচে স্থাপনপূর্বক তরবারি দ্বারা ভীষণ জোরে লৌহ বেড়িতে আঘাত করিলেন; তাহা কাটিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা মদীনার পানে ছুটিয়া চলিলেন। একটি মাত্র উট ছিল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর; তিনি মুক্ত বন্দীদ্বয়কে উটে চড়াইয়া নিজে এই দীর্ঘ প্রায় তিন শত মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলেন।* (সীরাতে ইবনে হেশাম)

* উল্লিখিত ঘটনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারীর নাম "ওলীদ" দেখিয়া মোস্তফা চরিত গ্রন্থে এই ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে এই কারণে যে, আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুক্তির জন্য যে নবী (সঃ) নামাযের মধ্যে দোয়া করিয়াছেন সেই দোয়ার মধ্যেই ওলীদ নামীয় ব্যক্তির মুক্তির জন্যও দোয়ার উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝা যায়, ওলীদও তখন

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর ওসমান (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করিলেন। (যোরকানী, ১-৩২০)

এইভাবে মক্কা হইতে প্রায় সকল মুসলমানই হিজরত করিয়া গেলেন। মক্কায় রহিলেন শুধু কতিপয় মজলুম মুসলমান- যাঁহারা দুর্বল হওয়া কিম্বা নিজ গোষ্ঠি জ্ঞাতিদের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ বা কারারুদ্ধ জীবন যাপনে বাধ্য ছিলেন। আর ছিলেন শাহেনশাহে দোজাহান সাইয়্যেদুল কাওনাইন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহারই আদেশে আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)।

যথাসম্ভব মুসলমানগণকে আশ্রয় ও নিরাপদ স্থান মদীনায় পৌঁছাইয়া দিয়াও নবীজী (সঃ) মক্কায় অবস্থান করিলেন আল্লাহ তাআলার অনুমতির অপেক্ষায়।

আনসারগণের সৌজন্য

মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় আসিয়া অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন। মদীনার আনসারগণ এই প্রবাসী ভ্রাতাদিগকে নিজ নিজ ঘরদুয়ার ও বিষয় সম্পত্তির অংশ প্রদানের প্রস্তাব দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। (১৭১৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে মোহাজের ভাইদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শনে আনসারগণ এক অতুলনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন মদীনার সর্বত্র ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল, মদীনাবাসী মুসলমানগণ ইসলামের উন্নতিকল্পে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

নবীজীর (সঃ) হিজরত (পৃষ্ঠা- ৫৫১)

মক্কা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মভূমি; নবুয়তের পূর্বে জীবনের বড় অংশ সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর এই মক্কায়ই কাটিয়াছিল। নবুয়তী জীবনেরও বেশী অংশ মক্কায়ই কাটিয়াছে। মক্কায়ই সৃষ্টির মুকুটমণি আল্লাহ তাআলার ঘর- কা'বা শরীফ অবস্থিত। এই সব কারণে মক্কার প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী, ভালবাসা ছিল অপরিমেয়। কিন্তু আল্লাহর ও আল্লাহর দ্বীনের ভালবাসা হইল সর্বোচ্চ, সর্বাধিক ও সর্বাগ্রে। দীর্ঘ তের বৎসরের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষায়ও যখন মক্কা ভূমিতে দ্বীন ইসলামের জন্য নিরাপত্তা সৃষ্টি হইল না, নিরাপদে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারের সুযোগ তথায় হইয়া উঠিল না, তখন নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বাধ্য হইলেন স্বদেশ ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণে। বিষাদ ও দুঃখভরা অন্তরে, ব্যথা বেদনা জড়িত হৃদয়ে স্থির করিলেন মক্কা পরিত্যাগ করিতে। এই সঙ্কল্প গ্রহণের পর মনোব্যথায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন-

مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَيَّ وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمِيْ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ -

অর্থ ঃ "মক্কা! কতই না ভাল তুমি!! কতই না ভালবাসি আমি তোমাকে!!! আমার জ্ঞাতিরা তোমার ক্রোড়ে আমাকে থাকিতে দিল না; নতুবা আমি তোমাকি ছাড়িয়া কোথাও বাস করিতাম না।"

(মেশকাত শরীফ ২৩৮)

মক্কায় বন্দী ছিলেন; সুতরাং উল্লিখিত ঘটনা নিশ্চয় অবাস্তব।

এই সংশয় জ্ঞান বিদ্যার অভাবপ্রসূত। কারণ, তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৪র্থ খণ্ডে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায়, সত্যই ওলীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কায় বন্দী ছিলেন এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ও সালামা (রাঃ)-এর সঙ্গে একই কারাগারে ছিলেন; সেই সময় মুক্তির দোয়ার মধ্যে আইয়্যাশ ও সালামার নামের সহিত ওলীদের নামও ছিল। পরে ওলীদ (রাঃ) কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। অপর বন্দীগণ কারাগারেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। নবী (সঃ) ওলীদের মুখেই আইয়্যাশ ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর নির্মম অত্যাচারের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের মুক্তির জন্য ওলীদ (রাঃ)-কে মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নবীজী (সঃ) যখন মক্কা ছাড়িয়া যাইবেন সেই বিচ্ছেদলগ্নে একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অশ্রুসজল নয়নে কা'বার প্রতি তাকাইলেন এবং গভীর মমতায় ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন–

وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَىَّ وَلَوْلاَ اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ـ

অর্থ ঃ খোদার কসম মক্কা! অতি উত্তম দেশ তুমি!! আমার অতি প্রিয় তুমি!!! আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। তোমা হইতে আমাকে বিতাড়িত করা না হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিতাম না। (ঐ)

অধিকাংশ আলেমের মতে জগতের বুকে সর্বোত্তম দেশ প্রিয় মদীনা। কিন্তু মদীনা এই গৌরব লাভ করিয়াছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণের পর। যাবত না নবী (সঃ) মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাবত ঐ গৌরব মক্কার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

হিজরতের সূচনা

মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মুসলমানগণ মদীনায় আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করিয়া তথায় তাঁহাদের কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ পাইতেছেন, মদীনা এলাকায় ইসলামের প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। এই সব সংবাদ মক্কাবাসীদের অবিদিত থাকে নাই এবং তাহারা এই সংবাদে বিচলিত না হইয়া পারে না। কারণ, তাহাদের সুখ-শান্তি ও বল-শক্তিরই নহে শুধু, বরং তাহাদের বাঁচিবার প্রশ্ন নির্ভর করে সিরিয়ার বাণিজ্যের উপর এবং সেই বাণিজ্যের পথ মদীনাবাসীদের বাগের মধ্যে। সুতরাং মদীনায় মুসলমানদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠা এবং তথায় মুসলমানদের শক্তি সৃষ্টি মক্কার কাফের গোষ্ঠীর জন্য মৃত্যু পরোয়ানা। তাই কোরায়শদের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। মুসলমানগণ হাতছাড়া হইয়াছে, মদীনার আওস ও খাযরাজ প্রসিদ্ধ শক্তিশালী দুইটি গোত্রের সমর্থন সহযোগিতা লাভের সুযোগ তাঁহারা পাইয়া বসিয়াছেন। ইহার উপর আবার স্বয়ং মুহাম্মদও (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া যোগ দিতে উদ্যত; এইরূপ হইলে ত ইসলাম ও মুসলমানগণ বহু শক্তি অর্জনের সুযোগ পাইয়া বসিল এবং একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কেন্দ্র গড়িয়া তোলার সকল প্রকার সুবিধাই লাভ করিয়া ফেলিল।

মক্কার মোশরেকরা ভালভাবেই জানিত, ইসলামের প্রাণশক্তির উৎসমুখ হইলেন মুহাম্মদ (সঃ)। সুতরাং তাঁহার মদীনা যাওয়া পণ্ড করিতে পারিলে মদীনায় ইসলামী কেন্দ্র গড়িয়া উঠার আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এমন কোন একটা ব্যবস্থা করার চিন্তা করিতে লাগিল যদ্দ্বারা এইসব সুযোগেরও চির সমাপ্তি ঘটে এবং রসূলুল্লাহর (সঃ) আন্দোলনই যেন চিরতরে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশে মক্কাবাসীরা এক শত মেম্বার সম্বলিত তাহাদের সর্বোচ্চ পরিষদ– "দারে নদওয়ার" এক পরামর্শ সভা আহবান করিল।

মক্কার কাফের শত্রুরা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে সর্বশেষ ব্যবস্থা স্থির করার জন্য বিশেষ গোপনীয়তার সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিল। এদিকে ইবলীসও এই সুযোগে ইসলামের মূল কর্তন করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। রসূলুল্লা (সঃ)-এর প্রাণ বিনাশে কোন সক্রিয় ব্যবস্থাবলম্বনে শত্রু দলকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে স্বয়ং ইবলীস شيخ نجدى আরব দেশীয় নজদ এলাকা নিবাসী প্রবীন মানুষের আকৃতি ও বেশে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। এমনকি এই সম্মেলনের মধ্যে সে-ই প্রস্তাব গ্রহণের ভূমিকায় প্রধান হওয়ার সুযোগ পাইয়া বসিল।*

---

* **সমালোচনা** ঃ আলোচ্য ঘটনায় নজদ নিবাসী বয়ঃবৃদ্ধের আকৃতিতে স্বয়ং ইবলীসের উপস্থিতিকে "মোস্তফা চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে। ছুতা ধরা হইয়াছে যে, "যাহারা ঐ কথা বলিয়াছেন তাঁহারা বৃদ্ধের মুখেও ঐ কথা শুনেন নাই, অথবা হযরতের মুখেও ঐ তথ্য অবগত হন নাই। কাজেই বৃদ্ধটি যে ছলধারী শয়তান ইহা তাহাদিগের অনুমান মাত্র।"

এইরূপ উক্তিতে হাসি না আসিয়া পারে না। সীরাত তথা চরিত শাস্ত্রের সমস্ত কিতাবেই আলোচ্য সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণ

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ হইতে লাগিল। একজন বলিল, মুহাম্মদ (সঃ)-কে বন্দী করিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া হউক; হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করত যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কারাগারে ভীষণ দণ্ড ভোগ করিতে করিতে একদিন মরিয়া যাইবে। শেখ নজদী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই প্রস্তাব কার্যকর করিলে তাহার লোকজন ও আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় খোঁজ পাইবে এবং তাহাকে উদ্ধার করিতে নিশ্চয় চেষ্টা করিবে; তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাও ঘটিবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত তাহারা উদ্ধার করিয়া নিয়াও যাইবে।

আর একজন বলিল, তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক; সে তাহার দলবলসহ দেশান্তরিত হইলে আমাদের দেশ ঠাণ্ডা হইবে। শেখ নজদী এই প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সে যে দেশে যাইবে সেখানেই তাহার বহু ভক্ত জুটিয়া যাইবে। তাহার মিষ্ট কথায় এবং কোমল ব্যবহারে অনেক মানুষ তাহার দলে ভিড়িবে। পরে আমাদেরও বিপদের কারণ হইবে; হয়ত সে দল জুটাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিবে এবং আমাদের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাহার জন্য সহজ হইয়া যাইবে।

অবশেষে আবু জাহল একটি প্রস্তাব আনিল যে, তাহাকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলে চির দিনের জন্য আমরাও স্বস্তি লাভ করিব এবং তাহার ধর্ম ইসলামকেও হত্যা করা হইয়া যাইবে। তবে একা একজনে হত্যা করিলে তাহার গোষ্ঠী হাশেম ও মোত্তালেব বংশ প্রতিশোধ গ্রহণে ছুটিয়া আসিবে। অতএব আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মক্কা এবং তাহার পার্শ্বস্থ সমুদয় গোত্র হইতে এক-একজন শক্তিশালী যুবক বাছিয়া লইয়া একটি দল গঠন করা হউক, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তরবারি প্রদান করা হউক; তাহারা সকলে এক সঙ্গে মুহাম্মদের উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করতঃ তাহাকে হত্যা করিবে। এই ব্যবস্থায় মূল উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া যাইবে এবং তাহার কোন পরিণামও বিশেষ ক্ষতিকর হইবে না। কারণ যেহেতু এই হত্যানুষ্ঠানে বহু গোত্রের লোক শামিল থাকিবে তাই বনু হাশেমগণ এতগুলি গোত্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বনে সাহসী হইবে না। আর প্রাণ বিনিময়ের জরিমানা আদায় করিতে হইলে তাহাও সকল গোত্রের উপর বণ্টিত হইয়া সহজসাধ্য হইয়া যাইবে।

প্রবীণ মানুষবেশী ইবলীস এই প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিল এবং সকলেই ইহার প্রতি সমর্থন জানাইল। তাহাদের উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করিতে রাত্রি বেলা রসূলুল্লাহর (সঃ) শয়ন গৃহ ঘেরাও করারও ব্যবস্থা হইল। শত্রুদের সম্মেলন শেষ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাঈল (আঃ) মারফত হযরত (সঃ) সমুদয় খবর জ্ঞাত হইয়া গেলেন, তাঁহাকে স্বীয় বিছানায় শয়ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল এবং মদীনার

উল্লেখ আছে এবং সুস্পষ্টরূপে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, উক্ত সমাবেশে স্বয়ং ইবলীস নজদ অধিবাসী বৃদ্ধের আকৃতিতে যোগদান করিয়াছিল। এখন যেই যুক্তিতে এই বিবরণ খণ্ডন করা হইয়াছে সেই যুক্তিতে ত মূল ঘটনা সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণেরও খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণও ত কেহ সভা অনুষ্ঠানকারীদের কিম্বা হযরতের মুখে শুনে নাই। বলাবাহুল্য সীরাত তথা চরিত শাস্ত্রের পূর্বাপর প্রচলিত গ্রন্থাবলীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই সীরাত বা চরিত গ্রন্থাবলী রচনা করা হইয়া থাকে, মোস্তফা চরিতও সেইরূপে রচিত। তাহার শত শত বর্ণনা প্রসিদ্ধ চরিত গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার লোকদের মুখে বা হযরতের মুখে শুনা হয় নাই, চরিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং যেই যুক্তিতে ইবলীসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ অস্বীকারযোগ্য সাব্যস্ত হইবে, সেই যুক্তিতে মোস্তফা চরিতের এবং বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের অধিকাংশ বিবরণ অস্বীকারযোগ্য হইবে। স্বয়ং ইতিহাস শাস্ত্রই পঙ্গু হইয়া যাইবে। ইতিহাস শাস্ত্রে কয়টি ঘটনা এইরূপ পাওয়া যাইবে যাহা মূল ঘটনার লোকদের মুখে শুনিয়া বা হযরতের মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে? অতএব উল্লিখিত যুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তি নহে, বাতুলতা মাত্র।

এতদ্ভিন্ন উল্লিখিত অস্বীকারের কারণ এলমের অভাবও বটে। ইবলীসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ ঘটনার অতি নিকটবর্তী লোক– মহামান্য, নির্ভরশীল আস্থার পাত্র, বিশিষ্ট ছাহাবী নবীজীর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সনদযুক্তভাবে বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– সীরাত গ্রন্থ বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৩–১৭৫ যোরকানী, ১–৩২১। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর ইতিহাস গ্রন্থ ২–৯৮।

পানে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হইল।*

নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় প্রস্থানের পরিকল্পনা করিলেন এবং ইহাও স্থির করিলেন যে, আলী (রাঃ)-কে মক্কায় রাখিয়া যাইবেন। কারণ, মক্কার জনসাধারণ তাহাদের সমাজপতিদের প্ররোচনায় অজ্ঞতাবশতঃ নবীজীর বিরুদ্ধাচরণ করিলেও নবীজী (সঃ)-কে এত দূর মহাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিত

যে, মক্কায় যাহার যেকোন মূল্যবান বস্তু বা টাকা পয়সা আমানত রাখার আবশ্যক হইত সে তাহা নিঃসংশয়ে নবীজীর নিকট রাখিয়া যাইত। কারণ, সব রকম বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও তিনি "সাদেকে আমীন বিশ্বাস্য নির্ভরশীল" বলিয়া সুপরিচিত হইলেন। এমনকি নবীজী যখন মক্কা ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন তখনও তাঁহার নিকট বহু মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকা-পয়সা গচ্ছিত ছিল। নবীজী (সঃ) যদি হঠাৎ এক দিনে সমুদয় গচ্ছিত বস্তু ফেরত দিয়া দেন তবে তাঁহার হিজরতের গোপন তথ্য ফাঁস হইয়া যায়। আর লোকদেরকে তাহাদের আমানত পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না করিলে তাহাই বা কিরূপ হয়! তাই নবীজী (সঃ) আলী (রাঃ)-কে ঐসব আমানত সোপর্দ করিয়া মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের সুব্যবস্থা করিয়া গেলেন। নবীজীর চরিত্র মাহাত্ম্য এতই অনাবিল ছিল।

নবীজী (সঃ) হিজরতের সুস্পষ্ট অনুমতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত গরমের মধ্যেই আবু বকরের গৃহে আসিলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার? নবীজী (সঃ) বিশেষ সর্তকতার সহিত আবু বকর (রাঃ)-কে অবগত করিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আবু বকর আরজ করিলেন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইব কি? নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে। এই সৌভাগ্যের সুযোগ লাভের অসীম আনন্দে আবু বকর (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারিণী আবু বকর তনয়া বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, মানুষ যে আনন্দেও কাঁদে তাহার দৃষ্টান্ত আমি ঐ দিনই দেখিলাম। (বেদায়া ৩-১৭৮)

আবু বকর (রাঃ) চারি মাস পূর্বে হিজরতের জন্য দুইটি উত্তম উট ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) হিজরতের সমুদয় ব্যবস্থা কথাবার্তা নির্ধারিত করিয়া নিলেন। হিজরতের ব্যবস্থা বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাই নবীজী (সঃ) রাত্রি আরম্ভে স্বীয় গৃহেই থাকিলেন যেন কাহারও কোন সন্দেহ না হয় এবং যাত্রার পূর্বেই কোন কেলেঙ্কারি সৃষ্টি না হইয়া পড়ে। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে এক দিকে নবীজী (সঃ) গৃহ ত্যাগের প্রস্তুতি করিতেছেন, অপর দিকে আবু জাহলের প্রস্তাব অনুযায়ী সে নিজে এবং অন্যান্য গোত্র হইতে সংগৃহীত মোট একশত জন শত্রুর দল নবীজীর (সঃ) গৃহ ঘেরাও করিয়া নিল। দারে নদওয়া মক্কার মিলনায়তনের পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমবেত অস্ত্রের আঘাতে নবীজীকে হত্যা করার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার জন্য তাহারা এই রজনীকেই নির্ধারিত করিয়াছে। আর নবীজী (সঃ)ও হিজরত করিতে গৃহ ত্যাগে এই রজনীকেই সাব্যস্ত করিয়াছেন; আবু বকর (রাঃ) পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী নিজ গৃহে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

নবীজী (সঃ) পূর্বেই আলী (রাঃ)-কে আমানতসমূহ প্রত্যর্পণের ভার গ্রহণ করার এবং নবীজীর কক্ষে অবস্থান করার বিষয় অবগত ও সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেমতে নবীজী (সঃ) নিজে সবুজ রঙ্গের যে

---

* উল্লিখিত তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে-

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ـ

"একটি স্মরণীয় ঘটনা- কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল; তাহাদের প্রস্তাব এই ছিল যে, আপনাকে বন্দী করিবে বা প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে বা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে। এই উদ্দেশে তাহারা গোপন ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল। আল্লাহ তাআলাও তাহাদের ষড়যন্ত্র বান চাল করার গোপন ব্যবস্থা করিতেছিলেন। (ফলে তাহাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইল, কারণ) আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাকারী।" (পারা-৯, রুকু-১৮)

চাদরখানা মুড়িয়া ঘুমাইতেন সেই চাদরেই আলী (রাঃ)-কে আবৃত করিয়া নিজের শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। নবীজী (সঃ) এখন গৃহ হইতে বাহির হইবেন, কিন্তু একশত প্রাণঘাতী শত্রুর দ্বারা তাঁহার গৃহ অবরুদ্ধ। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) সূরা ইয়াছীনের এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করিয়া অদম্য সাহসের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন–

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ -

অর্থ ঃ "আমি তাহাদের চতুর্দিকে বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদেরকে আবরণে ফেলিয়া দিয়াছি, ফলে তাহারা দেখিতে পাইবে না।"

পবিত্র কোরআনের ইহাও একটি অলৌকিক ক্রিয়া যে, আয়াতের মূল মর্ম ত পূর্বাপর বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যই উদ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন বাহ্যিক ক্রিয়াও আল্লাহ তাআলা তাহার বরকত ও উসিলায় সংঘটিত করেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা তাবিজ-গণ্ডা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি হাজার হাজার আমলের ঐরূপ ক্রিয়া আবহমানকালের অভিজ্ঞতায় সপ্রমাণিত রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাক-পবিত্র জবান মোবারকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করায় আল্লাহ তাআলা তাহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যময় ক্রিয়ার উপস্থিত ফল এই দান করিলেন যে, অবরোধকারী শত্রুদের দৃষ্টির উপর আল্লাহ তাআলার কুদরতী আবরণ পড়িয়া গেল; নবীজী (সঃ) নির্বিঘ্নে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন; শত্রুরা তাঁহাকে দেখিল না। এমনকি প্রস্থানকালে নবীজী (সঃ) শত্রুদের উদ্দেশ করিয়া কাঁকরময় মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাদের প্রত্যেকের মাথার উপর তাহার অংশ পতিত হইয়াছিল, কিন্তু মোটেই কোনরূপ টের পায় নাই। গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (সঃ) আবু বকরের গৃহে গেলেন এবং তাঁহারা উভয়ে ঐ গৃহের পিছন দিকের খিড়কি পথে বাহির হইয়া পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সওর পর্বত উদ্দেশে যাত্রা করিয়া গেলেন।

যাত্রাকালে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ وَلَمْ اَكُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى هَوْلِ الدُّنْيَا وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ وَمَصَائِبِ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَاخْلُفْنِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ وَلَكَ فَذَلِّلْنِىْ وَعَلٰى صَالِحِ خُلُقِىْ فَقَوِّمْنِىْ وَاِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَاِلَى النَّاسِ فَلاَ تَكِلْنِىْ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَنْ يَحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ وَيَنْزِلَ عَلَىَّ سَخَطُكَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ فَجَاَةَ نِقْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى عِنْدِىْ حَيْثُمَا اسْتَطَعْتُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ -

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ আমি কিছুই ছিলাম না। আয় আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন দুনিয়ার আপদ-বিপদে, সর্বদার ভয়-ভীতিতে, দিবা-রাত্রির বালা-মসিবতে। আয় আল্লাহ! আপনি আমার সঙ্গী হইয়া থাকুন আমার ভ্রমণে এবং আমার পরিবারে আমার অনুপস্থিতির অভাব আপনি পূরণ করিয়া দিন। আমাকে যাহা দান করেন তাহাতে বরকত দান করুন। আমাকে আপনার অনুরক্ত বানাইয়া রাখুন, সৎ চরিত্রের উপর আমাকে দৃঢ় পদ রাখুন, আমাকে আপনার প্রেমিক বানাইয়া

রাখুন। আমাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করিবেন না। আপনি সকল দুর্বলের এবং আমি দুর্বলেরও প্রভু, আমি আপনার দেয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করি। আপনার নূরে সমস্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল আলোকিত হইয়াছে, সকল প্রকার অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং পূর্বাপর সকলের সমস্ত কাজ-কারবার ঐ নূরের বদৌলতেই সুশৃঙ্খল হইয়াছে। আমাকে আশ্রয় দান করুন আমার উপর আপনার গজব পতিত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার নেয়ামত হারা হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে, অকস্মাৎ আপনার আযাবের আগমন হইতে, আপনার প্রদত্ত সুখ-শান্তির পরিবর্তন ঘটা হইতে। আপনার সকল প্রকার সন্তুষ্টি লাভই আমার একমাত্র কাম্য। আপনার সাহায্য ছাড়া বাঁচিবার স্থান ও শক্তি কোথাও কাহারও নাই।" (যোরকানী, ১-৩২৯)

এদিকে শত্র দল নবীজীর (সঃ) গৃহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, নবীজীর শয্যার উপর তাঁহারই চাদরে আবৃত আলী (রাঃ)-কে তাহারা হয়ত দ্বারের ফাটল দিয়া বা কোন প্রকারে শায়িত দেখিয়া মনে করিতেছিল, হযরত শুইয়া আছেন। এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতেছে অথচ তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের কোন সুযোগ পায় নাই, তাই অবশেষে ভোর বেলায় অবরোধকারীরা গৃহ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তথায় আলী (রাঃ)-কে দেখিয়া তাহারা হতবাক হইয়া গেল। তাহারা আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কর্তা কোথায়, আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না। (বেদায়া, ৩-১৮)।

তৎক্ষণাত আবু জাহল কতিপয় লোকসহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীতে গেল; তাহারা গৃহদ্বারে দাঁড়াইলে আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) তথায় আসিলেন। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর পিতা কোথায়? আস্‌মা (রাঃ) বলিলেন, আমি জানি না আব্বা কোথায় গিয়াছেন। আবু জাহল খবিস বজ্জাত আস্‌মা (রাঃ)-কে সজোরে চপেটাঘাত করিল- যাহাতে তাঁহার কানের বালি ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

(বেদায়াহ, ৩-১৭৯)

নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সওর পর্বতে

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সওর পর্বত উদ্দেশে পথ চলিতে লাগিলেন। নগর হইতে মাত্র ৩/৫ মাইল ব্যবধানেই এই পর্বত অবস্থিত। সুতরাং সাধারণভাবে রাত্রির অন্ধকারে শহর হইতে যাত্রা করিয়া ভোর হইতেই তথায় পৌছার কথা। কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া পথ অতিক্রম করায় এবং হয়ত সাধারণ পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করায় সওর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিবার পথেই দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে বিশ্রামেও বাধ্য হইয়াছিলেন, তাই সওর পর্বত গুহায় রাত্রে পৌঁছিয়াছিলেন। (ঐ, ২-১৭৯)

বুধবার দিন যাইয়া যে রাত্রি আসিল তাহা বৃহস্পতিবার রাত্র; এই রাত্রে গৃহ ত্যাগ করতঃ বৃস্পতিবার পূর্ণ দিন অতিক্রান্তে সওর পর্বতে পৌঁছিয়াছিলেন। সেই রাত্র জুমার রাত্র এবং জুমার দিন, তারপর শনিবার রাত্র ও দিন, তার পরে রবিবার রাত্র ও দিন- এই তিন রাত্র তিন দিন গুহায় বাস করিয়া রবিবার দিনের পর রাত্র সোমবার গভীর রাত্রে সওর পর্বত গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

(যোরকানী, ১-৩২৫)

গিরিগুহায় আবু বকর (রাঃ) ও নবীজী (সঃ)

রাত্রির অন্ধকারে সওর গিরি গুহার দ্বারে পৌঁছিয়া আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিলেন, আপনি বাহিরে অপেক্ষা করুন; আমি প্রথমে গুহার ভিতরে প্রবেশ করি; সর্প-বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক কোন কিছু থাকিলে তাহার দুঃখ আমার উপর দিয়াই যাইবে। এই বলিয়া প্রথমে আবু বকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ

করিলেন; গুহার চতুর্দিকে ছিদ্র পথ ছিল যাহা হইতে কোন দংশনকারী জীব বাহির হইতে পারিত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট অতিরিক্ত কাপড় ছিল; তিনি তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া ছিদ্রসমূহ কাপড় খণ্ড দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুইটি ছিদ্র বাকী থাকিতেই কাপড় শেষ হইয়া গেল। আবু বকর (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে ভিতরে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (সঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) উন্মুক্ত ছিদ্রের মুখ স্বীয় পা দ্বারা বন্ধ করিয়া উরু বিছাইয়া দিলেন; তাহার উপর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (সঃ) মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে ছিদ্রের ভিতর বিষাক্ত বিচ্ছু ছিল; আবু বকরের পায়ে বার বার দংশিতে লাগিল। নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কায় আবু বকর (রাঃ) বিচ্ছুর দংশন সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন, একটুও নড়িলেন না। কিন্তু বিষক্রিয়ায় তাঁহার চোখের অশ্রু নবীজীর চেহারার উপর পতিত হইল; নবীজী (সঃ) জাগিয়া গেলেন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীত– আমার পায়ে বিচ্ছু দংশিয়াছে। নবীজী (সঃ) দংশন স্থানে থুথু দিয়া দিলেন; তৎক্ষণাত আবু বকর (রাঃ) আরোগ্য লাভ করিলেন। নবীজী (সঃ) ঐ মুহূর্তেই আবু বকরের জন্য দোয়া করিলেন–

رَحِمَكَ اللّٰهُ صَدَّقْتَنِىْ حِيْنَ كَذَّبَنِىْ النَّاسُ وَنَصَرْتَنِىْ حِيْنَ خَذَلَنِىْ النَّاسُ وَاٰمَنْتَ بِىْ حِيْنَ كَفَرَ بِى النَّاسُ وَاٰنَسْتَنِىْ فِىْ وَحْشَتِىْ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়াছ যখন লোকেরা অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমি আমাকে সাহায্য করিয়াছ যখন লোকেরা আমার সাহায্য ছাড়িয়া দিয়াছে, তুমি আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছ যখন লোকেরা আমাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমার সান্ত্বনা যোগাইয়াছ উদ্বেগ অবস্থায়।" নবীজী (সঃ) আরও দোয়া করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَبَابَكْرٍ مَعِىْ فِىْ دَرَجَتِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! বেহশতে আমার শ্রেণীতে আমার সঙ্গে আবু বকরকে রাখিও।" (ঐ, ১–৩৩৫)

ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফত আমলে অবগত হইলেন যে, কোন কোন লোক তাঁহাকে আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম বলিয়া থাকে। ওমর (রাঃ) তখন কসম করিয়া বলিলেন, আবু বকরের (রাঃ) শুধু এক রাত্রের বা শুধু এক দিনের আমল সমগ্র ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া সওর গুহার উদ্দেশে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিতেছিলেন। ঐ সময় আবু বকর (রাঃ) কতক্ষণ নবীজীর পিছনে চলেন, আবার কতক্ষণ সম্মুখে। নবীজী (সঃ) তাঁহার এইরূপ চলনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, আবু বকর! তুমি এইরূপ চলিতেছ কেন? আকু বকর (রাঃ) বলিলেন, যখন পিছন হইতে ধাওয়াকারী শত্রুর আশঙ্কা করি তখন আপনার পিছনে চলি, আবার সম্মুখে অপেক্ষমাণ শত্রুর ভয় করি তখন আপনার সম্মুখে চলি। নবীজী (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কি এই কামনা কর যে, শত্রুর কোন আঘাত আসিলে তাহা আমাকে না লাগিয়া তোমাকে লাগে? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্য দ্বীন প্রদানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলি– তাহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতপর ওমর (রাঃ) গুহার ভিতরে রাত্রি বেলায় তাহার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করার পূর্ববর্ণিত ঘটনাও বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিলেন এবং কসম করিয়া বলিলেন, ঐ এক রাত্রের আমল গোটা ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম। (বেদায়া, ৩–১৮০)

একদা ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্মুখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আলোচনা হইল। ওমর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি– আমার সারা জীবনের আমল আবু বকরের (রাঃ) শুধু একটি রাত্র বা শুধু একটি দিনের আমলের সমপরিমাণ গণ্য হয়।

রাত্রটি হইল ঐ রাত্র যে রাত্রে তিনি এবং নবীজী (সঃ) এক সঙ্গে চলিয়া সওর গিরি গুহার দ্বারে পৌঁছিলেন। তথায় পৌঁছিয়া আবু বকর (রাঃ) নবীজীকে বলিলেন, আপনি গুহায় প্রবেশ করিবেন না, আপনার পূর্বে আমি প্রবেশ করিব; আঘাত পাওয়ার কোন কিছু তাহার ভিতরে থাকিলে আমিই পাইব, আপনার আঘাত লাগিবে না। সেমতে আবু বকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন; তাহার ভিতরে চতুর্দিকে ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একখানা অতিরিক্ত লুঙ্গি ছিল, সেই লুঙ্গিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিদ্রগুলির মুখ বন্ধ করিলেন; দুইটি ছিদ্র উণ্মুক্ত থাকিল; কাপড় শেষ হইয়া গিয়াছে; ঐ ছিদ্র দুইটি দুই পায়ে বন্ধ করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রবেশ করিলেন এবং আবু বকরের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন। ছিদ্র হইতে তাঁহার পায়ে বিচ্ছু দংশন করিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গার ভয়ে আবু বকর একটুও নড়িলেন না। তাঁহার অশ্রু ফোঁটা নবীজীর চেহারায় পতিত হইল; নবীজী জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে আবু বকর! তিনি বলিলেন, দংশন লাগিয়াছে– আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত। রসূলুল্লাহ (সঃ) দংশন স্থানে থুথু দিলেন তৎক্ষণাত আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শেষ জীবনে সেই বিষের ক্রিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং মৃত্যুর কারণ হইল। (ফলে তিনি নবীজীর জন্য শহীদ হওয়ার মর্তবা লাভ করিলেন).... (মেশকাত শরীফ ৫৫৬)

উল্লিখিত তথ্য ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাবাবেগ নহে, বাস্তব সত্যই বটে; স্বয়ং নবী (সঃ) ঐরূপই বলিয়াছেন।

হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অতি উজ্জ্বল চাঁদনী রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ক্রোড়ে হেলান দেওয়া ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আকাশের অগণিত নক্ষত্র সংখ্যার পরিমাণে কোন ব্যক্তির নেক বা সওয়াব আছে কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হাঁ– আছে, ওমর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে আবু বকরের নেকসমূহের পরিমাণ কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আবু বকরের একটি নেক ওমরের সারা জীবনের নেকসমূহের সমান। (মেশকাত শরীফ, ৫৬০)

গিরিগুহায় অসীম সাহসের পরিচয়

শত্রু দল নবীজীর গৃহে এবং আবু বকরের গৃহে তাঁহাদেরকে না পাইয়া ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের বাকী থাকিল না এবং ব্যবস্থা অবলম্বনেও তাহারা মোটেই বিলম্ব করিল না। অবিলম্বে তাহারা তাঁহাদের খোঁজে চতুর্দিকে ছুটিয়া পড়িল, বিশেষতঃ সেই যুগে একটি বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ ছিল, যাহাদিগকে কায়েফ বলা হইত। পদচিহ্নের পরিচয়, তাহার আবিষ্কার এবং অনুসরণ ঐ সম্প্রদায় অসাধারণে পটু হইত। ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদেরকে চতুর্দিকে নবীজী ও আবু বকরের গন্তব্যস্থানের খোঁজে লাগইয়া দেওয়া হইল। সওর পর্বতের দিকে যে দল চলিয়াছিল তাহারা তাঁহাদের পদচিহ্ন আবিষ্কার করিতে এবং তাহার অনুসরণ করতে সক্ষম হইল। তাহারা সেই সূত্র ধরিয়া চলিতে চলিতে সওর গিরি গুহার দ্বারে উপনীত হইল। (যোরকানী, ১–৩৩০)

সম্মুখে আর কোন পদ চিহ্নের নিদর্শন না দেখিয়া তাহারা ধারণা করিল, হয়ত এই গুহার ভিতরই আসামীরা লুকাইয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা তথায় থামিয়া গেল এবং আনাগোনা করিতে লাগিল; এমনকি গুহাভ্যন্তর হইতে আবু বকর (রাঃ) তাহাদেরকে দেখিতে ছিলেন। আবু বকর বিচলিত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখন উপায় কি? প্রাণঘাতী শত্রু দল নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই ত আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে– তখন যে, কি অবস্থা হইবে তাহা ত বলিতে হইবে না। ঐ সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভূমিকা অতি অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল।

অশিক্ষিত শত্রুরা নবীজীর (সঃ) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; শিক্ষিত শত্রু খৃষ্টানরা তদপেক্ষা অধিক

তীক্ষ্ণ অস্ত্র কলম ধারণ করিা নবীজীর সুনাম-সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের উপর কালিমা লেপনে তাহাদের সর্বময় শিক্ষা ও কৌশল ব্যয় করিয়াছে। ঐরূপ একজন স্বনামধন্য শত্রু 'মারগোলিয়থ'ও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলোচ্য ভূমিকার প্রশংসায় লিখিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)– চরম বিপদের সময় যাঁহার মানসিক বল সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিকশিত হইত, তিনি যে (এই মুহূর্তে) বিশেষ ধীরতা ও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দে নাই।"

মারগোলিয়থ গোষ্ঠী সত্যের দ্বারে পৌঁছিয়া যাইতে সক্ষম হইত যদি তাহারা আর একটু গবেষণা করিত যে, এই অদম্য মানসিক বল, এই অসীম সাহস, এই অটল ধৈর্য এবং চরম বিপদের মুখে উক্ত গুণাবলীর পরম বিকাশ হইবার মূল কোথায়!

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহর সত্য নবী, তিনি সত্যের অকৃত্রিম সেবক, বিশ্বাসের স্বর্গীয় আদর্শ। তিনি আপন হৃদয়ে আল্লাহকে এমনভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতরে বাহিরে সত্যের তেজ, আল্লাহতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অনুভূতি এমনভাবে গাঁথিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার কোন বিভীষিকা, ভীষণ হইতে ভীষণতর কোন বিপদ এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সুপ্রশস্ত মহান হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিত না, তাঁহার ধীরস্থিরতা সর্বদা অটুট থাকিত।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর যে ভূমিকা ছিল তাহাই উল্লিখিত দাবীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ বিভীষিকাপূর্ণ মহাসঙ্কটের মুহূর্তে যখন আবু বকরের (রাঃ) ন্যায় মানুষও বিহ্বল বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন– হায়! কি অবস্থা হইবে! শত্রু দল নিজেদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমাদেরকে দেখিয়া ফেলিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে যাহারা শুধু মানুষ তাহারা কি ব্যাকুল না হইয়া পারে? নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র দুইটি মানুষ। পলায়নের কোন পথ নাই, মুক্তির আশা নাই, ঘাতক দল গুহার মুখে দাঁড়াইয়া আছে– মৃত্যু একরূপ অবধারিত। কিন্তু সেখানেও নবীজী মোস্তফা (সঃ) সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত ও গভীর, পর্বতের ন্যায় স্থির অটল। বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা নাই, হতাশা নাই; আছে শুধু আল্লাহর করুণার আশা, রহমতে বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর দৃঢ় নির্ভরতা। প্রশান্ত চিত্তে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বকর (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" শুধু এতটুকুর উপর ক্ষান্ত না হইয়া আরও বলিলেন, "যেই দুই জনের তৃতীয় সঙ্গী থাকিবেন আল্লাহ, সেই দুই জনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কি ধারণা কর?"

১৭০২। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رضى الله تعالى عنه قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا فِى الْغَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا ـ

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আমরা (হিজরতের পথে সওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম, তখন আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম শত্রুগণ (আমাদের খোঁজে গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে) এখন তাহাদের কেহ যদি নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। এতদ শ্রবণে হযরত (সঃ) আমাকে বলিলেন, (এইরূপ কথা মুখেও আনিও না।) হে আবু বকর! ঐ দুই ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ মনে কর (যাহাদের পক্ষে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য-সহায়তা প্রতি মুহূর্তে বিদ্যমান রহিয়াছে যে,) আল্লাহ স্বয়ং এই দুই জনের তৃতীয় সাথী।

আরও অধিক আশ্চর্যের বিষয়– এই ঘোরতর সঙ্কটময় সময়েও নবীজী মোস্তফা (সঃ) গুহার ভিতরে নামাযে মগ্ন ছিলেন। তায়েফের ঘটনায়ও বলা হইয়াছে, বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবীজীর (সঃ)

সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের একমাত্র অবলম্বন ছিল নামায। তাই গিরি গুহার সঙ্কটময় সময়– যখন ঘাতক দল গুহার মুখে আনাগোনা করিতেছিল, তখনও নবীজী মোস্তফা (সঃ) নামাযে মগ্ন ছিলেন।(যোরকানী, ১–৩৩৬)

গিরিগুহার সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে নবীজী মোস্তফা (সঃ) মানুষের জন্য সান্ত্বনা লাভের এক চরম ভরসা রাখিয়া গিয়াছেন, এক কূলহীন প্রশস্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর করুণার উপর এমন ঐকান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিবে কি? আল্লাহ তাআলার করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া চাই না– ইহার অমর দৃষ্টান্ত ও চির স্মরণীয় আদর্শ স্থাপন করিলেন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গিরি গুহার সঙ্কট মুহূর্তে। আল্লাহ তাআলাও বলিয়াছেন–

لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহর করুণা হইতে নিরাশ হইও না।"

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর বুকভরা আশা ও বিশ্বাস ছিল সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলার করুণা লাভের; কার্যতঃ হইলও তাহাই। আল্লাহ তাআলা তথা হইতে ঘাতকদলের ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; অস্ত্রের বা ভূত-প্রেতের ভয় দেখাইয়া নহে, ঝড়-তুফান বা ভূমিকম্পের কাণ্ড ঘটাইয়া নহে; আল্লাহর কুদরতে নিজেদের ধারণা ত্যাগে বাধ্য হইয়া এবং তাহার বিপরীত বিশ্বাসে আসিয়া শত্রু দল ঐ স্থান ত্যাগ করিল, শুধু তাহাই নহে, বরং খোঁজাখুঁজির অভিযানই ত্যাগ করিয়া তাহারা ব্যর্থতা বরণ করিয়া নিল। এইভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রিয় রসূলকে প্রাণঘাতী পাষণ্ডদিগের কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

গিরি গুহায় আল্লাহ তাআলার সাহায্য

নবীজী মোস্তফা (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) রাত্রির শুরুর দিকেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় কাফেরদের পৌঁছিবার পূর্বে অনতিবিলম্বেই কুদরতে এলাহী কতিপয় অসাধারণ, কিন্তু সূক্ষ্ম কৌশলের ব্যবস্থা করিল। গুহার মুখে "রাআহ্" নামক এক প্রকার সাধারণ গাছ জন্মিল, তাহার শাখাগুলি গুহামুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। আর তথায় মাকড়সা জাল বুনিয়া দিল এবং এক জোড়া জংলী কবুতরও সেখানে বাসা বানাইয়া ডিম পাড়িল।

অনুসন্ধানী দল গুহামুখে পৌঁছিয়া তথায় কিছু সময় আনাগোনা করিল, এমনকি তাহাদের কেহ কেহ ঐ গুহার মধ্যে তাহাদের আসামী পলাইবার সম্ভানাও প্রকাশ করিল, কিন্তু তথায় মাকড়সার জাল এবং কবুতরের বাসা দৃষ্টে শেষ পর্যন্ত তাহারা ভাবিল, ঐ গুহায় নিশ্চয় কোন লোক প্রবেশ করে নাই, নতুবা মাকড়সার এইরূপ অক্ষত জাল থাকিত না এবং এইরূপভাবে কবুতরের বাসাও থাকিত না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা আর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না, খোঁজাখুঁজিও করিল না– তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল।

আল্লাহ তাআলার কী কুদরত! একবারে সাধারণ এবং নাজুক ও দুর্বল উপকরণ দ্বারা তিনি এমন দুর্ধর্ষ শত্রুদিগের সমুদয় অপচেষ্টা বন্ধ করিয়া দিলেন, ভয়াবহ অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ঘটনা প্রবাহের আশ্চর্যজনক দৃশ্যপট আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে কি সুন্দর ভঙ্গিমায় বর্ণনা করিয়াছেন–

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ـ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহর রসূলকে তোমরা যদি সাহায্য না কর, তবুও আল্লাহর সাহায্য তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। (তাহার দৃষ্টান্ত দেখ–) যখন কাফেরগোষ্ঠী তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিল তখন তিনি শুধু দুই জনের একজন ছিলেন (তৃতীয় কোন বাহ্যিক সঙ্গী তাঁহার ছিল না। কি করুণ দৃশ্য ছিল– !) যখন তাঁহারা দুইজন

গিরিগুহার আশ্রয় নিলেন। (আল্লাহর প্রতি কী দৃঢ় প্রত্যয় ছিল রসূলের!) যখন তিনি (এক বিভীষিকাপূর্ণ ভয়ঙ্কর মুহূর্তে) নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাঁহার উপর শান্তি ও ধীরস্থিরতা বর্ষণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে বিভিন্ন এমন বাহিনী নিয়োগ করিলেন যাহাদেরকে তোমরা দেখ নাই, যাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে নাই। আর কাফেরদের (সিদ্ধান্ত– নবীজীকে হত্যা করিবে, সেই) কথাকে আল্লাহ হেয়, নীচ তথা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। আল্লাহর (সিদ্ধান্ত– নবীজী (সঃ) অক্ষত থাকিবেন সেই) কথাই উপরে তথা বলবত থাকিল। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তাঁহার কৌশল অসীম। (পারা–১০, রুকু– ১২)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ– উল্লিখিত আয়াতের جنود জুনুদ শব্দটি বহুবচন; একবচন হইল جند জুন্দ যাহার অর্থ "বাহিনী"। বহুবচন দ্বারা নিশ্চয় বিভিন্ন বাহিনী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ফেরেশতা বাহিনীর সাহায্য ত তথায় ছিলই– যাহাদিগকে কেহ দেখে নাই; আর মাকড়সা ও কবুতর, যাহা সামান্য ও সাধারণ বস্তু হিসাবে কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা সেই সাহায্য হইয়াছে যে, শত্রু দল তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে– এই সাহায্য ত সশস্ত্র মানুষ দ্বারাও কঠিন ছিল। সুতরাং মাকড়সা এবং কবুতরও ঐ স্থানে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্যকারী বাহিনীর মধ্যে শামিল বলিয়া গণ্য হইবে।*

গিরি গুহায় পানাহারের ব্যবস্থা

গৃহ ত্যাগের প্রাক্কালে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরিবার বিশেষতঃ তাঁহার কন্যা আস্‌মা (রাঃ) নবীজী ও আবু বকরের জন্য উপস্থিত সহজসাধ্য সামান্য কিছু পাথেয় তৈয়ার করিয়া একটি থলিয়া ছোট একটি মশকে পানি ভরিয়া দিয়াছিলেন। থলিয়া ও শামুকের মুখ বাঁধিবার দড়ি পাওয়া যাইতেছিল না; তাড়াহুড়ার মধ্যে আস্‌মা (রাঃ) স্বীয় কোমরবন্ধ চিরিয়া এক খণ্ড নিজের জন্য রাখিলেন অপর খণ্ড থলিয়া ও মশকের মুখে বাঁধিতে ব্যয় করিয়া দিলেন। (যোরকানী, ১–৩২৮)

এতদ্ভিন্ন গিরি গুহায় থাকাকালে খাদ্য লাভের জন্য একটি ব্যবস্থাও আবু বকর (রাঃ) করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার একজন মুক্ত ও অতি ভক্ত ঈমানদার গোলাম ছিল আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ), তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে মদীনায় যাইবেন, কিন্তু এখনও তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহেই অবস্থান করেন তিনি আবু বকরের মেষপাল চরাইয়া থাকেন। পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী তিনি তাঁহার মেষগুলো চরাইতে চরাইতে সন্ধ্যা বেলা ঐ গুহার নিকটে নিয়া যাইতেন এবং রজনীর অন্ধকারে দুগ্ধ দোহাইয়া দিয়া আসিতেন। নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ঐ দুগ্ধ পানে রাত্র ও দিন কাটাইতেন; গুহায় অবস্থানের তিন দিনের প্রতি দিনই তিনি ঐরূপ করিতেন।

কোরায়শদের খবরাখবর গুহায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা

গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা যাত্রা করিতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এবং সতর্কতার জন্য মক্কাবাসীদের পকিল্পনা, সঙ্কল্প ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে অবগত থাকা আবশ্যক, নতুবা বাহির হইবার সুযোগ সুবিধা কিভাবে নিরূপণ করা হইবে?

আবু বকর (রাঃ) এই প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ছিলেন

*** সমালোচনা ঃ** মোস্তফা চরিত গ্রন্থে মাকড়সার ঘটনা অসত্য, বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিক ও মামুলীরূপে। বলা হইয়াছে– মাকড়সা দুনিয়াময় জাল বুনিয়া বেড়াইতে পারে, এখানে পারিবে না কেন? আর কবুতরের ঘটনাকে অপ্রামাণিক প্রচলিত গল্প বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অবিশ্বাস্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ অস্বাভাবিক– নবীর মোজেযাকেও স্বীকার না করার ভূতের আছরেই এইসব প্রলাপ। নতুবা মোস্তফা চরিতসহ সর্বস্তরের সঙ্কলনেই যে সীরাত বা চরিত গ্রন্থাবলী হইতে শত শত বর্ণনা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং হইয়া থাকে, সেইরূপব গ্রন্থাবলীতেই মাকড়সা ও কবুতর উভয়ের ঘটনাই বর্ণিত আছে এবং অস্বাভাবিক ঘটনারূপেই উল্লেখ হইয়াছে।

আবদুল্লাহ (রাঃ), তিনি ছিলেন অত্যন্ত চালাক চতুর, গভীর জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম কুশলী যুবক। তিনি সারা দিন মক্কায় খোঁজ-খবর করিয়া বেড়াইতেন– নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা হইতেছে, কি সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা করা হইতেছে। সকল প্রকার সংবাদ তথ্য অবগত হইয়া তিনি রজনীর গভীর অন্ধকারে সওর গুহায় আসিতেন এবং সব সংবাদ নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সমীপে ব্যক্ত করিতেন। তিনি গুহার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিতেন, কিন্তু প্রভাতে আলো ছড়াইবার পূর্বেই অন্ধকারের মধ্যে মক্কা নগরে প্রত্যাবর্তন করিতেন; যেন নগরেই রাত্র কাটাইয়াছেন, কেহ যেন ভাবিতেও না পারে যে, রাত্রে তিনি অন্য কোথাও গিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতিদিন তিনি সমুদয় তথ্য ও সংবাদ মক্কা নগরী হইতে গুহায় সরবরাহ করিয়া থাকিতেন।

বাহনের ব্যবস্থা

মক্কা নগরী হইতে সওর গুহা পর্যন্ত ত নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। গুহা হইতে মদীনা গমন ত বাহন ব্যতিরেকে সম্ভব হইবে না, তাই আবু বকর (রাঃ) তাহার সুব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নবীজী (সঃ) মুসলমানদিগকে মদীনায় হিজরত করার জন্য ব্যাপকভাবে উৎসুক করিয়া তুলিতেছেন, আবার আবু বকর (রাঃ)-কে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। এই সব ইঙ্গিতে আবু বকর (রাঃ) চারি মাস পূর্বেই উত্তম দুইটি উট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; উটদ্বয়কে ভালভাবে ঘাস-পাতা খাওয়াইয়া মোটা-তাজা শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছিলেন।

পার্বত্য মরু অঞ্চলে দূর দেশের পথচলা কঠিন কাজ; দিক ও পথ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার; তাহার জন্য বিশেষজ্ঞ পারদর্শী লোক আছে! ঐরূপ অঞ্চলে কাফেলা চলার জন্য সেই লোকের বিশেষ প্রয়োজন। বাড়ী হইতে যাত্রার অনেক পূর্বেই আবু বকর (রাঃ) সেইরূপ একজন অতি পারদর্শী লোককে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ওরায়কীত; সে তখন ত কাফের ছিলই, পরেও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খাঁটি ব্যবসায়ীর ধর্ম এবং যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবু বকর (রাঃ) এবং নবীজী (সঃ) তাহাকে নির্ভরশীল গণ্য করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সে পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার উত্তম পরিচয়ই দিয়াছে। আবু বকর (রাঃ) হিজরতের জন্য তৈয়ারী উটদ্বয় ঐ ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাদের পরিকল্পনা মতে তাহাকে বলিয়া দিলেন, (যাত্রা করার বুধবার দিবাগত রাত্রির পরবর্তী) তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর উটদ্বয় লইয়া তুমি সওর পর্বত গুহার নিকটে যাইবে। সেমতে বৃহস্পতিবার এবং শনিবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, রবিবার প্রভাতের দিকে সে উটদ্বয় লইয়া সওর পর্বত এলাকায় পৌছিল এবং রবিবার দিনটা অতিবাহিত হইয়া সোমবারের রাত্র আরম্ভে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিলে উটদ্বয়কে সওর গিরি গুহার দ্বারে উপস্থিত করিল।

গিরি গুহা হইতে মদীনাপানে

নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) বৃহস্পতিবার (দিনের পূর্বে) রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন; আজ রবিবার চতুর্থ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মক্কার কাফেররা তাহাদের সাধ্যমতে খোঁজাখুঁজি করিয়া নিরাশ হইয়াছে। এখন তাহারা পথেঘাটে খোঁজ করা হইতে ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত। নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) গিরি গুহায় তিনটি রাত্র দিন লুকাইয়া থাকার কষ্ট এই সুযোগের অপেক্ষায়ই সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনারসঠিক ফল ফলিয়াছে, তাই আজ রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রে অন্ধকার নামিয়া আসিলে তাঁহারা গিরি গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পানে যাত্রা করিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর

মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সময় মত উপস্থিত হইয়াছিলেন; খেদমত ও সেবার জন্য তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। নবীজী (সঃ), আবু বকর (রাঃ), আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) এবং পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ– এই চারি জনের ক্ষুদ্র কাফেলা মদীনার পানে যাত্রা করিলেন। নবীজী (সঃ) একা একটি উটের উপর, আবু বকর (রাঃ) ও আমের (রাঃ) একত্রে অপর উটটির উপর, আর আবদুল্লাহ তাহার নিজস্ব ব্যবস্থায় পথচলা আরম্ভ করিল। মক্কা-মদীনার পথিকরা সাধারণতঃ যে পথ দিয়া যাতায়াত করে সে পথে চলা মোটেই নিরাপদ নহে, তাই পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ কাফেলা লইয়া লোহিত সাগরের উপকূলীয় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।*

হিজরত প্রসঙ্গে চির স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ

জগতে কোন মহৎ কার্য সমাধা করিবার আয়োজন পর্বে যাহার উপর সেই কার্যের ভার ন্যস্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য যোগ্য সহচর, সহকর্মী মনোনীত করিয়া থাকেন। ইসলামের গৌরব ও উন্নতি সাধনের প্রত্যেক অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবীগণের ভূমিকা এই সত্যের উজ্জ্বল নমুনা।

ইসলামের শুধু রক্ষাই নহে, বরং চরম উন্নতির সোপান ছিল মদীনায় হিজরত। এই মহান হিজরতের আয়োজনকে যাহারা ধৈর্য, সাহস, দূরদর্শিতা, আত্মত্যাগ ও জীবনের উপর ঝুঁকি লইয়া নীরবে সুকৌশলে সফল ও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে এবং মুসলিম জাতির হৃদয় প্রকোষ্ঠে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ–

(১) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তিনি সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ইসলামের জন্য, সত্যের জন্য, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য নিজের জান-মাল সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় অনুরক্ত সুহৃদ ভক্ত জগতে দুর্লভ। হিজরত আয়োজনে এবং এই মহাযাত্রা সফল করিয়া তুলিতে তাঁহার ত্যাগ ও দান ছিল অপরিসীম। প্রাণের দুলালী কিশোরী আয়েশা ও সন্তান সম্ভবা তরুণী কন্যা আসমাসহ স্বজনকে কারায়েশ শত্রুদের মধ্যে ফেলিয়া নিজে মৃত্যুর বিভীষিকা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মক্কা হইতে মদীনায় পরিবহনের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই সম্পন্ন করিয়া রাখিলেন– চারি মাস পূর্বেই দুইটি উট ক্রয় করিয়া পোষণ করিলেন।

নবীজীর (সঃ) একটি মহান আদর্শ

আবু বকর (রাঃ) পরিবহন উদ্দেশে নিজের জন্য একটি এবং নবীজীর জন্য একটি উট চারি মাস পূর্বে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবীজী (সঃ) হিজরতের অনুমতি লাভ আবু বকরের গোচরে আনিলে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার

চরণে উৎসর্গীকৃত– এই বাহনদ্বয়ের একটি আপনি গ্রহণ করুন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, মূল্যদানে আমি এই উট গ্রহণ করিতে পারি, অন্যথায় নহে। নেতা, হাদী ও জাতির পরিচালক হওয়ার জন্য কত বড় মহান আদর্শ! নিজকে ভক্তগণের আর্থিক প্রভাব হইতে অতি সাবধানে মুক্ত রাখিবে, অপর দিকে নিজের জন্য কোন ভক্তের উপর আর্থিক চাপ ফেলিবে না। কত মূল্যবান শিক্ষা ও মহান আদর্শ ছিল ইহা!

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে– আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের জন্য বিভিন্ন

* নবীজীর হিজরত পথের বিশ্রামাগার বা মঞ্জিলগুলি বর্তমানে অপরিচিত। তাহার মধ্যে "রাবেগ" নামক স্থানটি অবশ্য সেই মহাযাত্রার পথের আংশিক সন্ধান প্রদান করে। রাবেগ স্থানটি বর্তমান মক্কা-মদীনার পথেও একটি প্রসিদ্ধ মঞ্জিল। তথা হইতে লোহিত সাগরের আবছায়া পরিদৃষ্ট হয়। যেই যুগে মক্কা-মদীনার নগর-নগরীতে মৎস দেখা যাইত না, তখনও রাবেগ মঞ্জিলে সামুদ্রিক মৎস্য উপভোগ করা যাইত। যদ্দরুন বাংলাদেশী হাজীগণ মক্কা-মদীনার পথে রাবেগ মঞ্জিলের অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকেন।

প্রয়োজনে চল্লিশ হাজার দেরহাম ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সব ব্যয় নবীজী মোস্তফা (সঃ) সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এহেন ভক্তের দান এইরূপ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নবীজী (সঃ) এড়াইয়া চলিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজী মোস্তফা (সঃ) এই আদর্শই দেখাইয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– "মৃত্যুর পূর্বে নবী (সঃ) পরিবারের আহার যোগাইতে নিজের লৌহবর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়া (দুই বা) তিন মণ খাদ্য তাহার নিকট হইতে বাকীতে ক্রয় করিয়াছিলেন। এমনকি মৃত্যুর সময় তাঁহার সেই লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক অবস্থায় ছিল। (বোখারী শরীফ, পৃষ্ঠা– ৬৪১)

আর্থিক অনটনে নবী (সঃ) ভক্তবৃন্দ ছাহাবীগণের নিকট হইতে ধার লইতে পারিতেন বা তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ খাদ্য ধারে ক্রয় করিতে পারিতেন; সে ক্ষেত্রে লৌহবর্ম বন্ধক রাখিতে হইত না। কিন্তু নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাহা করেন নাই, এমনকি ভক্তবৃন্দকে তাঁহার এইরূপ অনটন জ্ঞাতও হইতে দেন নাই; মৃত্যুশয্যায়ও এই আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই। নবী (সঃ) ভাবিয়াছেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহার এই অনটন বুঝিতে পারিলে ব্যস্ত হইবে– তাহা পূরণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না এবং কাহারও উপর তাহা অতিরিক্ত বোঝা হইতে পারে। এমনকি ধারে ক্রয় করিতেও এক ইহুদীর নিকট গিয়াছেন এবং বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন; কোন ভক্তের নিকট হইতে ধারে ক্রয় করেন নাই! কারণ, কোন ভক্ত এই ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ করিবে না, অথচ ইহা তাহার পক্ষে বোঝা হইতে পারে। কী অতুলনীয় আদর্শ ছিল নবীজীর! চির জীবন তিনি এই শ্রেণীর সোনালী আদর্শের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন স্বীয় কার্যের মাধ্যমে– শুধু বচনে নহে।

আলোচ্য উটটি চারি শত দেরহামে আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) সেই মূল্যেই উহা গ্রহণ করিলেন। এই উটটি নবীজীর অবশিষ্ট জীবনে "কাসওয়া" বা "জাদআ" নামের বাহন ছিল, অনেক অলৌকিক ঘটনা উহার সহিত বিজড়িত। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তিরোধানের পরও উহা জীবিত ছিল, অবশ্য কেহ উহা ব্যবহার করিত না, মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিয়া বেড়াইত। খলীফা আবু বকরের (রাঃ) আমলে উহার মৃত্যু ঘটে। (যোরকানী, ১–৩১৮)

নবীজী মোস্তফা (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) রাত্রি বেলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজেই সওর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, এমনকি পায়ে জুতাও ছিল না। নবীজী মোস্তফা (সঃ) প্রস্তরময় পার্বত্য পথে খালি পায়ে চলায় তাঁহার পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গুহায় পৌঁছিয়া চরণযুগলের রক্তধারা দৃষ্টে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম।

সওর পর্বত এক মাইলের অধিক উঁচু। হাঁটার করণে নবীজী (সঃ)-এর অত্যাধিক ক্লান্তি নিশ্চয় আসিয়াছে, তদুপরি চরণযুগলের ঐ অবস্থা, তাই পর্বতারোহণে নবীজী (সঃ) স্থানবিশেষে অপারগ হইয়া পড়িতেন। ঐ অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে স্বীয় কাঁধে বহন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে ঘোড়া, উট, খচ্চর এবং গাধাও বহন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রত্যেকটি বাহনই সেই বদৌলতে নিজ নিজ শ্রেণী ও জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ আবু বকর (রাঃ) ঐরূপ সঙ্কটাবস্থায় নবীজীর (সঃ) বাহন হইতে পারিয়া মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে ধন্য হইয়াছেন। আবু বকরের (রাঃ) এই শ্রেণীর ত্যাগ ও সেবাকে স্বয়ং নবীজী (সঃ) যেই ভাষায় স্বীকৃতি দিয়াছেন তাহা চির দিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন–

مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَداً يُكَافِئُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থ ঃ "আমার প্রতি যত মানুষের উপকারই রহিয়াছেন, প্রত্যেককেই আমি উহার প্রতিদান দিয়াছি একমাত্র আবু বকর ব্যতীত। আমার প্রতি তাঁহার এরূপ উপকার রহিয়াছে যাহার প্রতিদান আল্লাহ তাআলাই কেয়ামত দিবসে পূর্ণ করিবেন।" (তিরমিযী শরীফ)

(২) আলী (রাঃ), হিজরতের আয়োজন সফল করার মধ্যে তাঁহার ত্যাগ এবং অবদান ছিল অনেক বেশী। যেই শয্যায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু কাফেররা একরূপ অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শয্যার উপর স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেহ পাতিয়া রাখিয়াছিলেন আলী (রাঃ)। এমনকি নবীজীর চাদরখানাও মুড়ি দিয়া ভেল্কি লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন অবরোধকারী ঘাতকদের চোখে! কত বড় আত্মত্যাগ ও অসীম সাহসের চরম দৃষ্টান্ত ছিল ইহা! যেকোন মুহূর্তে তাঁহার উপর অবরোধকারী ঘাতকদের তরবারি পতিত হইতে পারিত। কারণ, ঘাতক দল তাঁহাকেই নবীজী ভাবিয়া তাঁরে অবস্থিত গৃহকে কড়া দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

(৩, ৪) আস্‌মা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)– পিতা তাঁহাদেরকে ঘোর বিপদে শত্রুর মধ্যে ফেলিয়া পাড়ি দিলেন মৃত্যুর পথে। এই দুশ্চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয়ে কী স্বাভাবিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু তাঁহারা আদর্শ মুসলিম রমণীরূপে ধরাপৃষ্ঠে জন্মিয়াছিলেন তাই একিবন্দুও অধীর হইলেন না। বরং সেই চরম দুর্ভাবনার মধ্যে নবীজী ও পিতার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের হাবভাবে কেহ ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝিতে পারিল না– কিসের আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা। কোথাও যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিত তবে সব আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইত– এই মহাযাত্রা হয়ত সম্ভব হইত না।

(৫) আবু বকর তনয় আবদুল্লাহ (রাঃ)– তিনি নিজ প্রাণের উপর ঝুঁকি লইয়া প্রত্যহ মক্কার সমুদয় সংবাদ পৌঁছাইয়াছেন নিভৃত সওর গুহায়। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিন দিন তিন রাত্র পরে বাহির হইয়াছিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) গুহা হইতে মদীনার পানে।

(৬) আবু বকরের মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) তিনি প্রত্যহ ঐ নিভৃত গুহায় আহার পৌঁছাইবার গোপন ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন।

ধন্য আবু বকর (রাঃ), আলী (রাঃ) ও আবু বকর পরিবার। তাঁহাদেরই আত্মত্যাগ, লক্ষ্য আদর্শের একমুখীতা, মনোবলরও কর্মকৌশল ইত্যাদি গুণাবলীর সমাবেশেই শত্রুদের বেষ্টন ভেদ করিয়া আল্লাহর আশ্রয়স্থলে যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান তাঁহাদের নিকট ঋণী হইয়া থাকিবে।

হিজরত পর্বের এই পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াবলীর মৌলিক বর্ণনা সম্বলিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ নিম্নে তরজমা করা হইল। হাদীছখানা অতি দীর্ঘরূপে বোখারী (রঃ) ৫২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কতিপয় ঘটনা একত্রে সমাবেশিত আছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেক ঘটনার অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তরজমা করিয়াছি। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর–আবিসিনিয়ায় হিজরত পরিচ্ছেদে "আবু বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরত" আলোচনায় প্রথম অংশের তরজমা হইয়াছে। এস্থানে দ্বিতীয় অংশের তরজমা দেওয়া হইল।

১৭০৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫২৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ার স্থানটি আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে– তথায় খেজুর বাগানের আধিক্য রহিয়াছে এবং উহার উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান বিদ্যমান। মদীনার এলাকাটি উক্ত উভয় গুণেরই বাহক। সেমতে অনেক মুসলমানই মদীনায় হিজরত করিয়া গেলেন, এমনকি যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অধিকাংশই মদীনায় চলিয়া গেলেন। আবু বকর (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি করিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে একটু থামিয়া যাইতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, আমি আশা করিতেছি, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাকেও হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হইবে। আবু বকর (রাঃ) হযরতের চরণে স্বীয় ত্যাগ কোরবানী পেশ করতঃ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি সত্যই ঐরূপ আশা পোষণ করিতেছেন। হযরত নবী (সঃ) বলিলেন, হাঁ। এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার উদ্দেশে হিজরত মুলতবী রাখিলেন এবং হিজরত উদ্দেশে তাঁহার সংগৃহীত বিশেষ দুইটি উটকে ভালভাবে

বাবুল পাতা খাওয়াইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন– এ অবস্থায় চারি মাস কাটিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা দ্বিপ্রহরের সময় আমার পিতা আবু বকরের (রাঃ) গৃহে আমরা বসিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের একজন আবু বকর (রাঃ)-কে সংবাদ দিল, ঐ দেখুন! (আপনার গৃহাভিমুখে) রসূলুল্লাহ (সঃ), (দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের কারণে) তিনি সম্পূর্ণ মাথা কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এরূপ দ্বিপ্রহরে ইতিপূর্বে আমাদের গৃহে কখনও তিনি আসেন নাই। আবু বকর (রাঃ) খবরটা শুনামাত্র চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতা-মাতা সর্বস্ব তাঁহার চরণে উৎসর্গীকৃত–তিনি নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণে এই সময়ে আমার গৃহে তশরীফ আনিতেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিমধ্যে হযরত (সঃ) গৃহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তৎক্ষণাত সাদর সম্ভাষণ জানানো হইল। হযরত (সঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলেন, ঘর হইতে লোকজন বাহির করিয়া দেওয়া হউক। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, একমাত্র আপনার স্বজনগণই গৃহে আছেন, অন্য কেহ নাই। হযরত (সঃ) বলিলেন, বিশেষ খবর এই যে, আমাকে মক্কা হইতে হিজরত করিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনার চরণে আমার পিতা-মাতা সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত– আপনি সঙ্গী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা রাখেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত– আপনি আমার উটদ্বয় হইতে একটি উট কবুল করুন। হযরত (সঃ) বলিলেন, কবুল করিলাম, কিন্তু মূল্যের বিনিময়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমরা তাঁহাদের জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে কিছু পাথেয়ের ব্যবস্থা করিলাম এবং কিছু খাদ্যবস্তু একটি থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া দিলাম। (আয়েশার ভগ্নী) আসমা (রাঃ) কোমরবন্ধের কাপড়খানা হইতে এক অংশ ফাড়িয়া উহা দ্বারা ঐ থলিয়ার মুখ বাঁধিয়া দিলেন। (তিনি যে, আল্লাহর রসূলের খদমতের জন্য স্বীয় কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে,) ঐ সূত্রেই তাঁহাকে "জাতুন নেতাকাইন"–"দুই কোমরবন্ধওয়ালী" বলা হইয়া থাকে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রাত্রি বেলা) হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) গোপনে গৃহ ত্যাগ করত সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছিলেন এবং তথায় তিন রাত্র লুকাইয়া থাকিলেন। আবু বকরের এক ছেলে ছিল আবদুল্লাহ– সে ছিল যুবক এবং অতিশয় চালাক চতুর। সে সারা রাত্রি ঐ পর্বত গুহায় তাঁহাদের নিকট থাকিত, কিন্তু প্রভাতে অন্ধকার থাকিতেই মক্কা নগরীতে আসিয়া যাইত, যেন সে মক্কার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিয়াছে। হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে কাফেররা যত কিছু ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিত, সব কিছুর সংবাদ আবদুল্লাহ রাত্রি বেলা তাঁহাদিগকে অবগত করিয়া আসিতেন। আবু বকরের একজন ক্রীতদাস ছিল "আমের ইবনে ফোহায়রা", সে বকরীর দল চরাইয়া ঐ পাহাড়ের নিকট লইয়া যাইত এবং রাত্রির অন্ধকার আসিয়া গেলে তাঁহাদিগকে দুগ্ধ পৌঁছাইত, তাঁহারা ঐ দুগ্ধের উপর রাত্রি যাপন করিতেন। আমের ইবনে ফোহায়রা রাত্রির অন্ধকার থাকিতেই বকরীর দল লইয়া তথা হইতে মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিত– প্রত্যহই সে এইরূপ করিত। এতদ্ভিন্ন হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) একজন সুবিজ্ঞ পথপ্রদর্শকও পূর্ব হইতেই মজুরির উপর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উভয়ের বাহন তাহার হাওয়ালা করিয়া দিয়া তাহাকে তিন রাত্র পর সওর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি কাফেরই ছিল, কিন্তু তাহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল।

নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী তিন রাত্র অতিবাহিত হইয়া প্রভাতেই সেই ব্যক্তি উটদ্বয় লইয়া সেই এলাকায় উপস্থিত হইল। (অবশ্য দিন অতিবাহিত হইবার পর রাত্রি বেলা সুযোগমতে) হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) পর্বতগুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। ক্রীতদাস আ'মের ইবনে ফোহায়রা এবং পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। পথপ্রদর্শক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে (সাধারণ চলাচলের পার্বত্য পথে অগ্রসর না করিয়া লোহিত সাগরের) উপকূলবর্তী পথে পরিচালিত করিল।

১৭০৪। হাদীছ ঃ (৫৫৫) আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য (হিজরতের সময়) রাস্তায় খাইবার কিছু খাদ্য তৈয়ার করিলাম এবং উহা একটি থলিয়ার মধ্যে রাখিলাম। থলিয়ার মুখ বাঁধিবার জন্য আমি আমার আব্বা আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলাম, বাঁধিবার কিছু পাইতেছি না, একমাত্র আমার কোমর বাঁধিবার কাপড়টা আছে। আব্বা বলিলেন, উহাই দুই খণ্ড করিয়া নাও। আমি তাহাই করিলাম (এবং এক খণ্ড আমার কোমরবন্ধের কাজে রাখিলাম, অপর খণ্ডের দ্বারা ঐ খাদ্যের থলিয়া এবং পানির মশকের মুখ বাঁধিয়া দিলাম।) সেই সূত্রেই আমাকে দুই কোমরবন্ধওয়ালী বলা হইয়া থাকে।

আবু বকরের সদা সতর্কতা

আবু বকর (রাঃ) বহিরাঞ্চলে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা অধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। দেশ-বিদেশের লোকজনের সহিত তাঁহার পরিচয় হইত। সেমতে হিজরতের-পথে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাত হইত যাহারা আবু বকর (রাঃ)কে চিনিত, কিন্তু নবী (সঃ)-কে চিনিত না। ঐরূপ কোন কোন লোক আবু বকর (রাঃ)-কে নবী (সঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত– আপনার অগ্রবর্তী লোকটি কে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আব বকর (রাঃ) বলিতেন, هذا الرجل يهدينى السبيل "এই ব্যক্তি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

প্রশ্নকারী ভাবিত, দুনিয়ার পথ প্রদর্শক, আর আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ করিতেন। এইভাবে নবীজীর (সঃ) পরিচয় গোপন থাকিয়া যাইত– ঐ সময় যাহার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল অথচ আবু বকর (রাঃ)-কে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইত না। মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া নবীজীর (সঃ) পরিচয় গোপন রাখার এক কৌশল ছিল। এই শ্রেণীর কৌশলকে শরীয়ত মতে "তৌরিয়া" বলা হয়। কাহারও কোন ক্ষতি না হয়– শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় ঐরূপ কৌশল অবলম্বন জায়েয ইহাকে ধোকা বলা যাইবে না। অবশ্য এইরূপ কৌশলে কাহারও ক্ষতি হইলে তাহা ধোকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নাজায়েয হইবে।

মদীনার পথে বিপদ

মক্কার মোশরেকেরা নবীজী (সঃ)-কে অনেক খুঁজিয়াও যখন পাইল না তখন তাহারা অন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সর্বত্র ঘোষণা জারি করিয়া দিল– মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও আবু বকরকে বন্দী বা নিহত করিতে পারিলে কোরায়শরা উভয়ের বিনিময়ে এক একশত উট পুরস্কার প্রদান করিবে। এই ঘোষণা তাহারা বিভিন্ন দলপতি এবং বিশিষ্ট লোকদের নিকটও বিশেষভাবে পৌঁছাইল।

কাফের-মোশরেকেরা ত নবীজীর (রাঃ) সর্বদার শত্রু আছেই, তদুপরি দুই শত উটের লালসা; অতএব নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-কে পাইবার প্রতি তৎকালীন আরবীয় দস্যু প্রকৃতির লোকদের কিরূপ আগ্রহ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আরবের "বনু মোদলাজ" গোত্র;কোরায়শরা তাহাদের নিকটও লোক পাঠাইয়া উক্ত ঘোষণার সংবাদ পৌঁছাইল! ঐ গোত্রেরই এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সোরাকা ইবনে মালেক; ঐ ঘোষণার সংবাদ সেও অবগত ছিল। একদিন তাহারই বংশীয় একজন লোক হঠাৎ বহু দূর হইতে নবীজীর (সঃ) কাফেলা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাত তাহাকে অবহিত করিল। সোরাকা দুই শত উটের পুরস্কার একা লাভ করিবার উদ্দেশে কৌশলের সহিত গোপনে অস্ত্র লইয়া কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিল।

আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সোরাকা যখন আমাদের অতি নিকটবর্তী আসিয়া গেল, তখন আমি অস্থির হইয়া বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের পিছনে ধাওয়াকারী আমাদেরকে পাইয়া ফেলিল! এই কথা

বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম, আমার জীবনের জন্য কাঁদি না, আপনার চিন্তায় কাঁদিতেছি। নবী (সঃ) সম্পূর্ণ শান্ত অবিচল কিন্তু আমার হতাশাদৃষ্টে আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তাহার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ হইতে তুমিই যথেষ্ট হইয়া যাও। হে আল্লাহ! তাহাকে পাছাড়ে পতিত কর।" অমনি তাহার ঘোড়ার পা পেট পর্যন্ত পার্বত্য পাথর জমিতে গাড়িয়া গেল। সে ব্যাপারটা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল, তাই চীৎকার করিয়া বলিল, নিশ্চয় আপনাদের বদ দোয়ায় আমার এই বিপদ আসিয়াছে। আমার জন্য দোয়া করুন আমি মুক্তি পাইয়া যাই। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করিব না, বরং আপনাদের হইতে শত্রু বিতাড়নে সাহায্য করিব। হযরত (সঃ) তাহার মুক্তির জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাকে কথা বলার সুযোগ দানে দাঁড়াইলেন।

সোরাকা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময়ই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) জয়ী হইবেন। আমি তাঁহাদের প্রতি লোকদের বিষাক্ত মনোভাব তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিলাম এবং আমার বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী পাথেয় ইত্যাদি গ্রহণের অনুরোধ করিলাম; তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। এমনকি আমি বলিলাম, অমুক স্থানে আমার মেষপাল রহিয়াছে, আপনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী উহা হইতে নিয়া যাইবেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার প্রয়োজন হইবে না। তিনি আমাকে শুধু এই বলিলেন, আমাদের সংবাদ গোপন রাখিও! আমার অভিপ্রায় মতে তিনি একটা চামড়া খণ্ডে আমার জন্য নিরাপত্তা পত্রও লিখিয়া দিলেন। ঘটনার মূল ব্যক্তি সোরাকা ইবনে মালেকের ভ্রাতার মাধ্যমে ভ্রাতুষ্পুত্র আবুদুর রহমান হইতে বোখারী (রঃ) নিম্নের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন– যাহা মূল কিতাবে ১৭০৩ নং হাদীছের সঙ্গেই রহিয়াছে।

১৭০৫। হাদীছ ঃ সোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিকট কোরায়শ কাফেরদের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, কোরায়শরা রসূলুল্লাহ এবং আবু বকরকে হত্যা বা বন্দী করার উপর (প্রত্যেকের জন্য) একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছে।

অতপর একদিন আমি আমার গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে বসিয়া খোশগল্প করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া আমায় খবর দিল যে, আমি উপকুলবর্তী পথে কতিপয় পথিকের গমন লক্ষ্য করিয়াছি; আমার মনে হয় মুহাম্মদ এবং তাহার সঙ্গীগণই হইবে। সোরাকা বলেন, আমি তখন পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া নিলাম যে, সেই পথিকগণ তাঁহারাই হইবেন, কিন্তু ঐ খবরদাতা ব্যক্তিকে পুরস্কার লাভের সুযোগ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশে প্রবঞ্চনাস্বরূপ বলিলাম, ঐ পথিকগণ তাঁহারা নহেন, বরং ঐ পথিকগণ হইতেছে অমুক অমুক, কিছু সময়ের জন্য খবরটার প্রতি তৎপরতা না দেখাইয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিলাম। তারপর তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম এবং আমার এক দাসীকে বলিলাম, আমার ঘোড়াটা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া অমুক স্থানে আড়ালে নিয়া রাখ এবং আমি আমার বল্লমটা হাতে লইয়া বাড়ীর পিছন দিকের পথে বাহির হইলাম, এমনকি বল্লমটার ফলক নীচের দিকে রাখিয়া শোয়াইয়া নিয়া চলিলাম। (উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য এইসব ব্যবস্থা; যেন অন্য কেহ সঙ্গী হইয়া পুরস্কারের অংশীদার না হইয়া বসে।)

এইরূপ গোপনভাবে আমি আমার ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উহার উপরে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে চালাইলাম, এমনকি অল্প সময়ের মধ্যে আমি ঐ পথিকদের নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম। এমতাবস্থায় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খাইয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া আমি আমার তীরদান হইতে গণনকার্যের তীর বাহির করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম আমি উদ্দেশে সফলকাম হইব কিনা। গণনার ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধী বাহির হইল, কিন্তু আমি গণনার ফলাফলের পায়রবী না করিয়া পুনঃ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া উহাকে দ্রুত অগ্রসর করিলাম এবং এত নিকটবর্তী হইয়া গেলাম যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতে

লাগিলাম। তিনি কিন্তু পিছনের দিকে মোটেও তাকান না, অবশ্য আবু বকর (রাঃ) বার বার (পিছনে আমার দিকে) তাকাইতে ছিলেন। ইতিমধ্যে আমার ঘোড়ার সম্মুখের পা দুইটি হাঁটু পর্যন্ত (পাথরীর) যমীনের মধ্যে গাড়িয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। অতপর আমি উহাকে সজোরে হাঁকাইলাম, ঘোড়াটি উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পা দুইখানা উঠাইতে সক্ষম হইতেছিল না। অবশ্য অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, যে স্থানে তাঁহার পা গাড়িয়া গিয়াছিল তথা হইতে ধুলা-বালু ধুঁয়ার ন্যায় আকাশের দিকে উঠিতেছে। তখন পুনরায় আমি গণনকার্যের তীর দ্বারা গণনা করিলাম, এইবারও ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধীই বাহির হইল। তখন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দানের ধ্বনি উচ্চারণ করিলাম। সেমতে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট পৌঁছিলাম। আমি যখন তাঁহাদের নিকট পৌছিতে বিপদগ্রস্ত হইতেছিলাম, তখন আমার অন্তরে এই কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আন্দোলনটা অচিরেই প্রাধান্য লাভ করিবে, তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন।

অতপর আমি তাঁহাকে জানাইলাম, আপনার দেশবাসী আপনার বিনিময়ে একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা জারি করিয়াছে। তাঁহাকে আমি লোকদের সমুদয় ইচ্ছা-এরাদার বিস্তারিত বৃত্তান্তও শুনাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাদের খেদমতে খাদ্য এবং আবশ্যকীয় বস্তু পেশ করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্য কোন কিছুই আমার ব্যয় করিতে হইল না। তাঁহারা আমার নিকট কোন অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন না শুধুমাত্র একটি কথা হযরত (সঃ) আমাকে বলিলেন– আমাদের সংবাদটা গোপন রাখিও। তখন আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম, আমার জন্য একটি নিরাপত্তা-দানপত্র লিখিয়া দিন। হযরত (সঃ) আ'মের ইবনে ফোহায়রাকে লিখিবার আদেশ করিলেন। তিনি একটি চর্ম খণ্ডে উহা লিখিয়া দিলেন। তারপর হযরত (সঃ) চলিয়া গেলেন। (আমি ফিরিয়া আসিলাম)।

সোরাকা ইবনে মালেকের ইসলাম গ্রহণ

সোরাকা নবীজী (সঃ)-এর কাফেলাকে বিদায় দিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। সে তাহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন মানুষকে নবীজীর তালাশকারী পাইত তাহাকেই বলিত, আমি অনেক তালাশ করিয়াছি; তোমার তালাশের প্রয়োজন হইবে না। যখন এই সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে, নবী (সঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া সারিয়াছেন তখন সোরাকা তাহার পূর্ণ কাহিনী লোকদের নিকট বর্ণনা করা আরম্ভ করিল। কিভাবে সে নবীজীর কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিল, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল ও অবিচল ভরসা কিরূপ দেখিল এবং তাঁহার ঘোড়ার সমুদয় ঘটনা কিরূপ ঘটিল– এই সব সে সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিল।

সোরাকার বর্ণিত ঘটনাবলী দেশময় ছড়াইয়া পড়িল;কোরায়শ দলপতিরা ইহাতে দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল যে, এইরূপ অলৌকিক ঘটনা শ্রবণে অনেক লোক মুসলমান হইয়া যাইবে। সোরাকা একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তিনি বনু মোদলাজ গোত্রের বিশিষ্ট বিত্তশালী সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে ইসলাম প্রসারের আশঙ্কা করিয়া আবু জাহল কাব্যের মাধ্যমে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিল–

بَنِىْ مُدْلَجٍ اِنِّىْ اَخَافُ سَفِيْهَكُمْ - سُرَاقَةَ مُسْتَغْوٍ لِنَصْرِ مُحَمَّدٍ
عَلَيْكُمْ بِهٖ اَلاَّ يُفَرِّقَ جَمْعَكُمْ - فَيُصْبِحُ شَتّٰى بَعْدَ عِزٍّ وَسُوْدَهٖ -

অর্থ ঃ "হে বনু মোদলাজ গোত্র। তোমাদের বাকা সোরাকা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়! সে লোকদের বিভ্রান্ত করিয়া মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্যের পথে আকৃষ্ট করিবে। তোমরা সতর্ক

থাকিও, সে যেন তোমাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের বংশ প্রাধান্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে।

সোরাকা এই সতর্কবাণীর উত্তরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কবিতা প্রচার করিল–

اَبَا حَكَمٍ وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِداً ـ لاَمْرِ جَوَادِى اِذْ تَسَوَّخَ قَوَائِمُه

عَجِبْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِاَنَّ مُحَمَّداً ـ رَسُوْلٌ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُه ـ

عَلَيْكَ فَكُفَّ الْقَوْمَ عَنْهُ فَاِنَّنِىْ ـ اَخَالُ لَنَا يَوْمًا سَتَبْدُوْ مَعَالِمَه ـ

অর্থ ঃ "হে আবুল হাকাম (আবু জাহল)! খোদার কসম, তুমি যদি উপস্থিত থাকিতে আমার ঘোড়ার ঘটনার সম্মুখে * যখন উহার পাগুলি গাড়িয়া গিয়াছিল; তবে তুমিও আশ্চর্যান্বিত হইতে এবং তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এই বিষয়ে যে, মুহাম্মদ রসূল এবং সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ । এমন কে আছে যে তাঁহার প্রতিদ্বিতা করিতে পারে? তুমি যাও– লোকদিগকে তাঁহার হইতে বিরত রাখার চেষ্টা কর; আমার ত ধারণা– অচিরেই এমন দিন আমাদের সম্মুখে আগত যেদিন তাঁহার প্রাধান্যের ও বিজয়ের নিদর্শনসমূহ দিবালোকের ন্যায় প্রকটিত হইয়া উঠিবে।" (বেদায়া, ৩–১৮৯)

আরবের পৌত্তিলিকদের মধ্যে তৎকালে আত্মীগর্ব আত্মশ্লাঘা অত্যধিক ছিল। নিজেদের নীতি ও কৃষ্টি ত্যাগ করা তাহাদের জন্য কঠিন ছিল। নবীজীর (সঃ) পিতৃব্য খাজা আবু তালেব নবীজীর (সঃ) সত্যবাদিতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু নিজ পূর্বপুরুষদের নীতি ও কৃষ্টি রক্ষায় এতই দৃঢ় ছিলেন যে, শত বুঝিয়াও মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করিলেন না। সোরাকার অবস্থাও প্রায় সেইরূপই হইতে যাইতেছিল। সে নিজের ঘটনার অলৌকিকতার দ্বারা নবীজীর রসূল হওয়ার পক্ষে আবু জাহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে, কিন্তু সব কিছু জানিয়াও ঈমান গ্রহণে অনেক বিলম্ব করিয়াছে।

হিজরতের ঘটনার সাত বৎসর পর অষ্টম বৎসরে মক্কা বিজয়ের সংলগ্নে হোনায়ন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মক্কা হইতে ১২/১৩ মাইল ব্যবধানে "জেয়ে'ররানা" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) অবস্থানরত ছিলেন। তখন নবীজীর চতুর্দিকে কত ভিড়! লোকে লোকারণ্য– এই সময় সোরাকা তথায় উপস্থিত ছিলেন। নবীজী (সঃ) প্রদত্ত চর্ম খণ্ডে লিখিত নিরাপত্তানামা তখনও তাহার নিকট সুরক্ষিত ছিল। লোকেরা তাহাকে নবীজীর (সঃ) নিকট যাইতে বাধা দিতেছিল, তাই সে দূর হইতে নিরাপত্তানামাসহ হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচ্চকণ্ঠে বলিল, ইয়া

---

* **সমালোচনা** "মোস্তফা চরিত" গ্রন্থের সঙ্কলক আকরম খাঁ মরহুমের কুঅভ্যাস নবীগণের মোজেযা বা অস্বাভাবিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা। তাঁহার এই কুঅভ্যাসটা বাতিক রোগ অপেক্ষা অধিক নিরারোগ্য। ঐ শ্রেণীর সামান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার স্বভাব ভুলেন না।

সোরাকা ইবনে মালেকের আলোচ্য ঘটনায় তাহার ঘোড়ার সম্মুখ পদদ্বয় গাড়িয়া যাওয়ার চিত্রকে তিনি তাঁহার সঙ্কলনে যে ভাষায় তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রচেষ্টা একমাত্র ইহাই যে, ঘটনাটা নিছক স্বাভাবিক ছিল– ইহাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই ছিল না। তাঁহার বক্তব্য এই–" সোরাকা দিগ্বিদিক না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছিল, ঘোড়াটাও লম্ফন কুর্দনপূর্বক বাধাবিঘ্নগুলি উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়াছিল– এই উত্তেজনা ও অসতর্কতার ফলে ঘোড়ার সম্মুখ পদদ্বয় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল।"

নবীর অস্বাভাবিক ঘটনা মোজেযাকে স্বাভাবিক বানাইবার অপচেষ্টা খাঁ মরহুমের উল্লম্ফন কুর্দন দেখিলে হাসি আসে। ঘটনা ত বাংলাদেশের বিল অঞ্চলে কাদা ও নরম মাটির মধ্যে নহে যে, লম্ফন উল্লঙ্ঘনে স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার পা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যাইবে। ঘটনা ত আরব দেশের পার্বত্য পাথরী যমীনের; সেখানে লম্ফন উল্লঙ্ঘনে ঘোড়ার পা, তাহাও পিছনের পদদ্বয় নহে– শুধু সম্মুখ পদদ্বয় প্রোথিত হইয়া যাওয়া এবং উহা স্বাভাবিকভাবে হওয়ার দাবী একমাত্র পাগলেই করিতে পারে। বিশেষত বোখারী শরীফের হাদীছেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, শক্ত পাথরী যমীনে ঘোড়ার পা গাড়িয়া গিয়াছিল।

সর্বোপরি ঘটনার মূল সোরাকা, যিনি এ ঘোড়ার পৃষ্ঠে ছিলেন, তিনি তাঁহার কাব্যে উক্ত ঘটনাকে অস্বাভাবিক সাব্যস্ত করিয়া নবীজীর (সঃ) রসূল ওয়ার প্রমাণরপে আবু জাহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন– ইহার মোকাবিলায় খাঁ মরহুমের কুর্দন উল্লঙ্ঘন কি কোন ফলদায়ক হইবে?

রসূলাল্লাহ! এই যে, আপনার দেওয়া লিখিত নিরাপত্তানামা আমার নিকট রহিয়াছে; আমি সোরাকা ইবনে মালেক। নবীজী (সঃ) বলিলেন, যাহাকে যে কথা দেওয়া হইয়াছে আজ তাহা পূরণ করিবার দিন; এই বলিয়া নবীজী (সঃ) সোরাকাকে তাঁহার নিকটে পৌছিবার সুযোগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সোরাকা নবীজী মোস্তফার (সঃ) চরণে শরণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ)। (সীরাতে ইবনে হেশাম)

দস্যু দলের আক্রমণ

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)কে বাগে না পাইয়া কোরায়শরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব হইতে জানিত রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায়ই যাইবেন, তাই তাঁহাদের প্রত্যেককে হত্যা বা বন্দী করার জন্য একশত উট পুরস্কারের ঘোষণাটা মদীনা যাওয়ার পথের এলাকাসমূহে জোরালোভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

সেই বৃহৎ পুরস্করের আশায় আসলাম গোত্রের প্রধান "বোরায়দা" ৭০ জন দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে লইয়া নবীজীর (সঃ) কাফেলার খোঁজে বাহির হইল। খোঁজ পাইয়াও বসিল। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষুদ্র কাফেলার সহিত তাহাদের সাক্ষাত হইল। কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত! কি ভয়াবহ দৃশ্য!

একদিকে ৭০ জন দুর্ধর্ষ সশস্ত্র দস্যু বিদ্বেষ ও প্রলোভনে উত্তেজিত উৎসাহিত এবং যাঁহাদের মুণ্ডপাতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য ও দুই শত উট লাভের আশা, তাঁহাদেরকে বাগে পাইয়া বসিয়াছে। অপর দিকে নিরস্ত্র নিরীহ মাত্র চার জন লোক– তাহার মধ্যেও একজন বিধর্মী এবং তাঁহারা ভীত সন্ত্রস্ত পলাতক পথিক– ঐ দুস্য দলের কবলে পতিত।

এই অবস্থায় মানুষের কল্পনায় নবীজীর রক্ষাপ্রাপ্তি সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে কি? এহেন ঘোর বিপদ মুহূর্তেও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধীরস্থিরতায় এবং স্বর্গীয় গাম্ভীর্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো অবস্থায় একটু চাঞ্চল্য বা অধৈর্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লাহর কার্যে নীরব-অবিচল আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ-নির্ভরতার এই প্রভাব যে– রক্ষা করার সকল ভার এবং সমস্ত ভাবনা একমাত্র আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কর্তব্যের এই সাধনা এবং বিশ্বাসের এই তেজ ও ঈমানের এই শক্তিই হইল ঐ অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার মূল উৎস।

কী প্রশান্ত চিত্ত, প্রশস্ত হৃদয়! দস্যু দলপতি বোরায়দা নবীজীর (সঃ) সম্মুখে আসিতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) ধীর কণ্ঠে শান্ত স্বরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, বোরায়দা। "বোরায়দা" শব্দ "বার্‌দ" ধাতু হইতে এবং বার্‌দ অর্থ শীতলতা, শান্তি; এই সূত্রে তাহার নাম হইতে নবী (সঃ) শুভলক্ষণ* গ্রহণপূর্বক আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের কার্যে শান্তি ও শীতলতা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? সে বলিল, "আসলাম" গোত্রের। "আসলাম" শব্দ "সেল্‌ম" ধাতু হইতে, যাহার অর্থ নিরাপত্তা নিষ্টন্টকতা। ইহা হইতেও শুভলক্ষণ গ্রহণপূর্বক নবী (সঃ) বলিলেন, আমাদের কন্টক দূর হইবে, নিরাপত্তা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বংশ-শাখার, সে বলিল, "বনু সাহ্‌ম" হইতে। "সাহ্‌ম" অর্থ তীর। নবী (সঃ) বলিলেন, হে আবু বকর! তোমার সৌভাগ্যের তীর আগত।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশান্তে দস্যু দলপতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল, তাহার সর্বাঙ্গে শিথিলতা ও শীতলতা আসিয়া গেল; দুস্যতার পরিবর্তে এখন তাহার মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে কোমল স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিচয় কি? নবীজী (সঃ) আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠতাপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন– انا محمد بن عبد الله رسول الله "আমি আবদুল্লাহর

* যেকোন বস্তু হইতে শুভলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয আছে, কিন্তু কোন কিছু হইতেই কুলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয নাই।

পুত্র মুহাম্মদ– আল্লাহর রসূল" (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। বোরায়দা নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না, প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বর্গীয় দৃষ্টির তীর তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া গেল। সে দমিত ও নমিত, কিন্তু আত্মবলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়া উঠিল–

আশ্‌হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।

দলপতি বোরায়দার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচররাও ইসলাম গ্রহণে নবীজীর (সঃ) চরণে লুটাইয়া পড়িল। কী অপূর্ব দৃশ্য! এক / দুই জন নহে–৭০ জন রক্ত-মাতাল হিংস্র শত্রু মুহূর্তের মধ্যে বশীভূত হইয়া মিত্রে পরিণত হইয়া গেল। সত্যের বল-শক্তি এইরূপই হয়–জাদুমন্ত্রের শক্তিও উহার সম্মুখে তুচ্ছ।

বোরায়দা (রাঃ) অবনত মস্তকে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করিলেন যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন; কোন প্রকার বাধ্য হইয়া নহে। নবীজী (সঃ) রাত্রির বিশ্রাম শেষে ভোর বেলা যাত্রা করিলেন। তখন বোরায়দা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাফেলা উড্ডীয়মান বিজয় পতাকার সহিত মদীনায় প্রবেশ করিবে। সেমতে বোরায়দা (রাঃ) নিজ আমামা–শিরস্ত্রাণ দ্বারা তাঁহার বর্শা ফলকে ইসলামের বিজয় নিশান তৈয়ারী করিয়া মহা উৎসাহে বীর দর্পে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। মদীনা বেশী দূরে নহে; কাফেলাওয়ালাদের মনে কতই না পুলক ও কৌতূহল! নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়া চলিয়াছেন সকলে; আর বোরায়দা (রাঃ) অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করিয়া। এই মনোহর দৃশ্য সমেতই কাফেলা পৌঁছিল মদীনার উপকণ্ঠে।

(যোরকানী, ১–৩৫০)

মদীনার পথে খাদ্যের ব্যবস্থা

আবু বকর (রাঃ) গৃহ ত্যাগকালে কিছু পাথেয় সঙ্গে লইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন পথিমধ্যেও সুযোগমত আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐরূপ একটি ঘটনা এই–

১৭০৬। হাদীছ ঃ বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মদীনাপানে যাইতেছিলেন তখন সোরাকা ইবনে মালেক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে ধাওয়া করিল। হযরত নবী (সঃ) তাহার প্রতি বদ দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাত ঐ ব্যক্তির বাহন ঘোড়ার পা যমীনে গাড়িয়া গেল! সে ভয় পাইয়া হযরত (সঃ)-কে অনুরোধ করিতে লাগিল, আপনি আমার জন্য দোয়া (করিয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার) করুন: আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। সে মুক্তি পাইয়া গেল।

অতপর হযরত (সঃ) পিপাসা অনুভব করিলেন, এমতাবস্থায় এক রাখালের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন; সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আমি একটি পাত্র লইয়া ঐ রাখালের নিকট হইতে কিছু দুগ্ধ দোহাইয়া আনিলাম। হযরতের নিকট সেই দুগ্ধ পেশ করিলে তিনি তাহা পান করিলেন, যাহাতে আমার অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেল।

১৭০৭। হাদীছ ঃ (৫১৫) আ'যেব (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শত্রু কাফেররা আপনাদের তালাশে পিছনে ধাওয়া করিল, তখন আপনারা কি করিয়াছিলেন? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, মক্কা হইতে (মক্কার এলাকাস্থ সওর পর্বত গুহায় তিন দিন লুকাইয়া থাকার পর তথা হইতে রাত্রি বেলা) বাহির হইয়া আমরা সারা রাত্র পথ চলিলাম এবং পরের দিনও চলিলাম; যখন উত্তাপময় দ্বিপ্রহরের সময় উপস্থিত হইল তখন আমি বিশ্রামের উদ্দেশে ছায়ার জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং বড় একটি পাথরের ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। তথাকার জায়গাটা একটু সমান করিয়া বিছানা বিছাইয়া দিলাম এবং হযরত

নবী (সঃ)-কে আরাম করার অনুরোধ জানাইলাম। নবী (সঃ) আরাম করিলেন এবং আমি চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এই উদ্দেশে যে, শত্রু দলের পক্ষ হইতে আমাদের তল্লাশকারী কাহাকেও দেখা যায় কি-না।

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক বকরীর রাখাল তাহার বকরী দল হাঁকাইয়া এই পাথরের দিকে নিয়া আসিতেছে; তাহারও উদ্দেশ উহাই যে উদ্দেশে আমরা পাথরটির নিকট আসিয়াছি। আমি তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মালিক কে? সে তদুত্তরে কোরায়শ বংশের এমন এক লোকের নাম উল্লেখ করিল যে আমার পরিচিত। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বকরী পালের মধ্যে দুগ্ধবতী বকরী আছে কি? সে বলিল, হা আছে। আমি বলিলাম, আমাদের জন্য দুগ্ধ দোহাইয়া দিবে কি? সে বলিল, হাঁ দিব এবং একটি বকরী সেই উদ্দেশে বাঁধিয়া রাখিল। বকরীর স্তন হইতে ধুলা-বালু ভালরূপে ঝাড়িয়া ফেলার অতপর তাহার হাতদ্বয় ভালরূপে ঝাড়িতে বলিলাম। সে তাহা করিয়া আমার জন্য দুগ্ধ দোহাইল। সেই দুগ্ধ আমি একটি পাত্রের মুখে কাপড় রাখিয়া ছাঁকিয়া এবং উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সুশীতল ঠাণ্ডা করিলাম, অতপর তাহা লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, হযরত (সঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! দুগ্ধ পান করুন। হযরত তৃপ্তির সহিত ঐ দুগ্ধ পান করিলেন। আমি তাহাতে খুবই আনন্দিত হইলাম। তারপর আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূল্লাল্লাহ (সঃ)! এই সময় কি পুনঃ যাত্রা আরম্ভ করিবেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ। সেমতে আমরা যাত্রা করিলাম।

এদিকে মক্কাবাসীগণ আমাদের খোঁজে লাগিয়া আছে, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে বাগে পায় নাই। অবশ্য একমাত্র সোরাকা ইবনে মালেক নামক ব্যক্তি আমাদের খোঁজ পাইল এবং দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া আমাদের নিকটে চলিয়া আসিল। তখন আমি আতঙ্কিত অবস্থায় আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ। পিছনে ধাওয়াকারী আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। হযরত (সঃ) ধীর স্থিরতার সহিত বলিলেন, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা করিও না– আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

মদীনার পথে নবীজীর কাফেলা আরও কয়েক স্থানে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ঐ সবের বিবরণ এই

উম্মে মা'বাদের কুটিরে নবীজীর (সঃ) কাফেলা

নবীজীর (সঃ) কাফেলা "কোদায়দ" নামক বস্তিতে পৌঁছিল। তথায় একটি কুটিরে উম্মে মা'বাদ পরিবার বাস করিত। উম্মে মা'বাদ এক পুণ্যাত্মা বৃদ্ধা, তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। সে তাহার গৃহাঙ্গনে বসিয়া থাকিত, শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকদের খাদ্য-পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করিত, তাহাদের সেবা করিত।

ঐ এলাকায় তখন খুব অভাব, অনাবৃষ্টির দরুন ঘাস-পাতারও খুব অভাব। তাই পশুপালের অবস্থাও অতিশয় সূচনীয়। উম্মে মা'বাদের স্বামী মেষপাল চরাইতে বহু দূরে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। এই সময় নবীজীর (সঃ) কাফেলা ঐ কুটীর পৌঁছিল এবং তাহারা দুগ্ধ, গোশত বা খেজুর যাহাই হউক ক্রয় করিতে চাহিলেন। উম্মে মা'বাদ বলিল, আমার নিকট পানাহারের কিছু থাকিলে আমি আপনাদের আতিথেয়তায় কার্পণ্য করিতাম না, আমি নিজেই আপনাদের সেবা করিতাম, আপনাদের মূল্য দিতে হইত না।

নবী (সঃ) লক্ষ্য করিলেন, কুটিরের এক প্রান্তে অতি কৃশ ও দুর্বল একটি ছাগী শুইয়া আছে। নবীজী (সঃ) উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ছাগীটির কি অবস্থা? সে বলিল, উহা এতই দুর্বল যে, মেষপালের সঙ্গে চরিতে যাওয়ার বলও পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে দুগ্ধ আছে কি? সে বলিল, উহা দুগ্ধ দানের সম্ভাবনা হইতেও অনেক অধম। তারপরও নবীজী (সঃ) উম্মে মা'বাদকে বলিলেন, ঐ ছাগীটা দোহন করিতে অনুমতি আছে কি? সে বলিল, উহার স্তনে দুধ আছে মনে করিলে দোহন করিতে পারেন। নবী। (সঃ) উম্মে

মা'বাদের ছোট্ট ছেলে মা'বাদকে বলিলেন, হে বালক! ছাগীটা নিয়া আস ত। ছাগীটা নিয়া আসিলে নবী (সঃ) দোহনের জন্য উহাকে আবদ্ধ করিলেন এবং বিসমিল্লাহ বলিয়া স্তনে ও পেটে হাত বুলাইলেন এবং দোয়াও করিলেন। পুনরায় উহার স্তনে হাত বুলাইলেন এবং বার বার আল্লাহর নাম জপিলেন।

অতপর বলিলেন, বড় একটি পাত্র আন– যাহার খাদ্যে এক দল লোকের পেট পুরিতে যথেষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই ছাগীটার স্তন দুগ্ধে ফাঁপিয়া উঠায় পিছনের পাদ্বয় ফাঁক করিয়া দিল এবং জাবর কাটিতে আরম্ভ করিল। নবী (সঃ) প্রবল বেগে দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিলেন। বড় পাত্রটি দুগ্ধপূর্ণ হইলে সর্বপ্রথম ঐ পাত্র উম্মে মা'বাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে কাফেলার লোকদের প্রদান করিলেন। প্রত্যেকে বার বার পান করিয়া অতিমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইল। সকলে পরিতৃপ্ত হইলে সর্বশেষে নবীজী মোস্তফা (সঃ) পান করিলেন। এহেন মহান আদর্শ কার্যত শিক্ষাদানের পর মৌখিকও বলিয়া দিলেন–"সকলকে পান করাইবার ভার যাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে সে সকলের পরে পান করিবে।" অতপর দ্বিতীয় বার ঐ পাত্রে দোহন করিয়া পুনঃ পুনঃ সকলকে পান করাইলেন। নবীজীর দ্বারা এই অসাধারণ বরকত লাভে তাহারা তাঁহাকে "মোবারক"–বরকত ও মঙ্গলময় বলিয়া প্রশংসা করিল।

তারপর নবী (সঃ) তৃতীয়বার ঐ পাত্রে দুধ দোহন করিয়া উম্মে মা'বাদের গৃহে রাখিয়া গেলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী– মা'বাদের পিতা বাড়ী আসিলে তাহাকে পান করাইও। নবীজীর (সঃ) কাফেলা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া গেল; ইতিমধ্যেই স্বামী আবু মা'বাদ মেষপাল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। ঘাসের অভাবে মেষগুলি এতই দুর্বল ছিল যে, হাঁটিতে সক্ষম হইতেছিল না, এতই কৃশ ছিল যে, উহাদের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্ধ কোথা হইতে পাইলে? মেষপাল ত বাড়ীতে ছিল না, দুগ্ধের কোন ছাগীও গৃহে ছিল না। উম্মে মা'বাদ বলিল, তোমার কথা সত্যই, কিন্তু আমাদের গৃহে এক "মোবারক"–বরকতময় মহৎ ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল তাঁহার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়াছে। অতপর উম্মে মা'বাদ দুগ্ধ দোহনের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া শুনাইল। আবু মা'বাদ কৌতূহলে সেই মহান আগন্তুকের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। উম্মে মা'বাদ স্বামীর নিকট নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-গুণের বিবরণ যে ওজস্বিনী ভাষায় প্রদান করিয়াছিল, উহার যথাযথ অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব নহে। সামান্য কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে। উম্মে মা'বাদ বলিল–

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি– অতি উজ্জ্বল বর্ণ সুপুরুষ তিনি, মুখশ্রী তাঁহার দীপ্ত ও আভাপূর্ণ, চরিত্র তাঁহার অতি মধুর, পেট তাঁহার স্ফীত নহে, দেহ তাঁহার কৃশ নহে– সুন্দর সুঠাম। খুব কাল তাঁহার চোখের তারা, ঘন ও সুদীর্ঘ তাঁহার নয়নের লোমরাজি। কর্কষ নহে– গম্ভীর তাঁহার স্বর, নয়নযুগলে অতি সাদার মধ্যে অতি কাল পুতুলি; প্রকৃতিই যেন সুরমা দিয়া দিয়াছে তাঁহার নয়নে, ভ্রূযুগল পরস্পর সংযোজিত, অতি কাল তাঁহার কেশদাম, গ্রীবা তাঁহার দীর্ঘ, দাড়ি তাঁহার ঘন। মৌন অবস্থায় তাঁহার উপর গুরুগম্ভীর ভাবের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, কথা বলিলে সকলের মনপ্রাণ মোহিত করিয়া দেয়। তাঁহার কথা মুক্তার দীর্ঘ মালার ন্যায় সুবিন্যস্ত– তাহা হইতে যেন এক একটি মুক্তা পর পর খসিয়া পড়িতেছে। মিষ্ট ও প্রাঞ্জল তাঁহার ভাষা, সুস্পষ্ট তাঁহার বর্ণনাধারা, ত্রুটি থাকে না আধিক্যও হয় না তাঁহার কথার মধ্যে। দূর হইতে দেখিলে তাঁহার রূপ-লাবণ্য মুগ্ধ করিয়া ফেলে, নিকটে আসিলে (তাঁহার ঐশিক প্রভাব দৃষ্টি ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু) তাঁহার প্রকৃতির মাধুরী মোহিত করিয়া ফেলে। দেহ তাঁহার মধ্যমাকার– দেখায় অপ্রিয় দীর্ঘও নহে, হেয় মানের খর্বও নহে, (পুষ্টি ও পুলকে সেই দেহ) রসাল বৃক্ষ ডালার ন্যায়– সেই ডালা কচিও নহে দীর্ঘ দিনেরও নহে। তিন জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক সুদর্শন ও সুমহান। সঙ্গীরা তাঁহাকে সদা বেষ্টন করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার কথা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে এবং কোন আদেশ করিলে অতি আগ্রহের সহিত পালন করে। সকলের সেবার পাত্র তিনি, সকলেই তাঁহার হুজুরে জটলা বাঁধিয়া থাকে। তিনি বিষণ্ন আকৃতিতে থাকে না। তিরস্কার করা ধিক্কার দেওয়া তাঁহার স্বভাবে নাই।

আবু মা'বাদ স্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শুনিবা মাত্র শপথ করত বলিয়া উঠিল, ইনিই ত কোরায়শদের সেই মহান। তাঁহার দর্শন পাইলে নিশ্চয় তাঁহার চরণে আমি শরণ লইতাম; তাহার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া যাইব। আমি তাঁহার সাহচর্যের কামনা করি, সুযোগ পাইলে সেই মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিব।

নবীজী (সঃ) চলিয়া যাওয়ার পরও ছাগীটি সকাল-বিকাল ঐরূপ অসাধারণভাবে দুগ্ধ দিয়া থাকিত এবং দীর্ঘ দিন বাঁচিয়াও ছিল। (যোরকানী, ১-৩৪০)

আবু মা'বাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, সাধনা তাঁহার সফল হইল। স্বামী আবু মা'বাদ এবং স্ত্রী উম্মে মা'বাদ সপরিবারে মদীনায় উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উম্মে মা'বাদের ভ্রাতা "হোবায়শ"ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে উম্মে মা'বাদ হইতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের সকলে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ। (যোরকানী, ১-৩৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

উম্মে মা'বাদের ঘটনা জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল; তাহারা অদৃশ্য কণ্ঠে কাব্যের মাধ্যমে মক্কায় এই ঘটনা সুললিত সুরে গাহিয়া প্রচার করিল।

আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পিতা আবু বকর (রাঃ) ও নবীজী মোস্তফা (সঃ) গৃহ ত্যাগের ৪/৫ দিন পরে আমরা ত তাঁহাদের কোন সংবাদ অবগত নহি; ইতিমধ্যেই একটি অদৃশ্য কণ্ঠের এই কবিতা মক্কার লোকজন শুনিতে পাইল।

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ ـ رَفِيْقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَىْ أُمِّ مَعْبَدِ

هُمَا نَزَلاَ بِالْبِرِّ وَارْتَحَلاَ بِهٖ ـ فَاَفْلَحَ مَنْ اَمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ

سَلُوْا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَاِنَائِهَا ـ فَاِنَّكُمْ اِنْ تَسْأَلُوْا الشَّاةَ تَشْهَدِ

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ ـ لَهٗ بِصَرِيْحٍ صَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ

فَغَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ ـ يَدُرُّ لَهَا فِىْ مَصْدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ ـ

অর্থ ঃ "সকলের প্রভু আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন ভ্রমণ সঙ্গীদ্বয়কে, যাঁহারা উম্মে মা'বাদের কুটিরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাপুণ্যবানরূপে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং ঐরূপেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বন্ধুত্ব যাহারই লাভ হইয়াছে, সাফল্য লাভে সে-ই ধন্য হইতে পারিয়াছে। তোমাদের ভগ্নী উম্মে মা'বাদকে তাহার ছাগী এবং বিরাট পাত্রের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর; ঐ ছাগীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মুহাম্মদ (সঃ) উম্মে মা'বাদকে ডাকিলেন তাহার এমন একটি ছাগীর জন্য, যাহা ছিল বন্ধ্যা (অতএব উহার স্তনে দুগ্ধের অস্তিত্বই ছিল না), কিন্তু ঐ ছাগীর স্তন খাঁটি দুগ্ধ এমন প্রবল বেগে প্রদান করিল যে, উহার ফেনার স্তূপ জমিয়া গেল। অবশেষে ঐ ছাগীটি উম্মে মা'বাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, প্রত্যেক দোহনকারী উম্মে মা'বাদের জন্য পুনঃ পুনঃ দুগ্ধ দোহন করিতে থাকিবে। (বেদায়া ও যোরকানী,৩৪২)

উম্মে মা'বাদের নিবাস এলাকা "কোদায়দ" মক্কা-মদীনার পথে মদীনা অপেক্ষা মক্কার অধিক নিকটবর্তী ছিল। বদান্যতা গুণে সে মক্কা এলাকায় পরিচিত ছিল এবং তাহার কুটির পথিকদের বিশ্রামাগার ছিল,, দেশ-বিদেশের পথিকগণ তথায় সেবা ও সহানুভূতি পাইয়া থাকিত, তাই ঐ কুটিরও লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। সেমতে জ্বিনদের উক্ত কবিতা মক্কার মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল এবং যাঁহারা নবীজীর (সঃ) কাফেলার সংবাদ জ্ঞাত হইতে আগ্রহী ছিলেন তাঁহারাও আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

উম্মে মা'বাদের কুটিরে ছাগী দোহনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মোজেযা। এ মোজেযাটির বিভিন্ন দিক ছিল। যথা–

১। ঘাসের অভাবে ছাগীটি এতই কৃশ ও দুর্বল ছিল যে, চারণ ভূমিতে যাইতে অক্ষম ছিল। উম্মে মা'বাদ নিজেই এই কথা বলিয়াছিলেন। অতএব সাধারণভাবেই উহা দুগ্ধশূন্য ছিল। নবীজীর (সঃ) মোজেযায় তাহাতে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল।

২। ছাগীটির কোন বাচ্চা জন্মিয়াছিল না, যাহাতে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইতে পারে। জ্বিনদের কাব্যে যে ঐ ছাগীটির গুণবাচক حائل হাএল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার আভিধানিক অর্থই হইল كل انثى لا تحمل " ঐ মাদী জীব যে গর্ভধারণ করে না" অর্থাৎ বন্ধ্যা। সেমতে ঐ ছাগীটি গর্ভধারণের যোগ্যই ছিল না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারই হইতে পারে না। একমাত্র নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযায়ই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

৩। বড় পাত্র– যাহার মধ্যে একদল লোক পরিতৃপ্ত হওয়ার পরিমাণ পানীয় সামলাইতে পারে– স্বাভাবিকরূপে একটি অতি উত্তম ছাগী হইতেও ঐরূপ পাত্র বারংবার পরিপূর্ণ হওয়ার মত দুগ্ধ লাভ হইতে পারে না। এই ঘটনায় ঐরূপ হইয়াছিল এবং ৭/৮ জন মানুষ পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; ইহাও মোজেযাই ছিল।

৪। আরও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয় এই ছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ঐ ছাগীটি এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে দুগ্ধ দিতেই ছিল।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তের পরশে উল্লিখিত অস্বাভাবিক ঘটনাই বাস্তবায়িত হইয়াছিল, যাহা দৃষ্টে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীগণ নবীজী (সঃ)-কে স্বতঃস্ফূর্ত "মোবারক" নামে আখ্যা দিয়াছিল এবং আবু মা'বাদ নিজ গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। মুসলমান জ্বিন সম্প্রদায়ও এই ঘটনাকে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্য রসূল হওয়ার সাক্ষ্যরূপে প্রচার করিয়াছিল। এইসব তথ্য সীরাত তথা চরিত-শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ কিতাবসমূহের সবগুলিতেই বর্ণিত রহিয়াছে।*

মদীনার পথে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম কর্তৃক আহার যোগাইবার এরূপ আরও ঘটনা সীরাত গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রহিয়াছে।

ঐরূপ আরও ঘটনা

মদীনার পথে নবীজী (সঃ)-এর কাফেলা এক রাখালের নিকট দিয়া যাইতেছিল, আহারের প্রয়োজন

সমালোচনা ঃ "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে ছাগীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় সমুদয় তথ্য হইতে চোখ বন্ধ করিয়া শুধু গ্রন্থকারের নিজ অনুমানের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে স্বাভাবিক প্রমাণ করিবার অপচেষ্টায় বলা হইয়াছে– "সম্ভবত কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল তাহা পথিকগণের পক্ষে নিত্যান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সাথে পানি মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল।"

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন! ইতিহাসে বর্ণিত তথ্যগুলিকে কিরূপে মুছিয়া ফেলা হইল। বলা হইল– কয়েক দিনের দুগ্ধ স্তনে সঞ্চিত ছিল; অথচ ছাগীটি ছিল হায়েল অর্থাৎ বন্ধ্যা, যাহার গর্ভে বাচ্চা জন্মে না, স্তনে দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে? বলা হইয়াছে, পথিকগণের পক্ষে; অথচ গৃহস্বামীরাও পান করিয়াছিল, এমনকি অনুপস্থিতের জন্যও এক পাত্র রাখা হইয়াছিল। বলা হইয়াছে, নিতান্ত অপ্রচুর হইল না, অথচ প্রত্যেকে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে মোস্তফা-চরিত গ্রন্থকার দুগ্ধে পানি মিশ্রিত করা সাব্যস্ত করিল, তবুও মোজেযা স্বীকার করিল না।

এইরূপ অপদার্থ মগজ হইতে নিঃসৃত বাতুলতার সমালোচনা করা যায়? প্রবীণ পণ্ডিত মরহুমের সমালোচনা হয়ত পাঠককেও মর্মাহত করে। কিন্তু নবীজীর মোজেযার প্রতি স্বীকৃতি দানে যাহারা এত সঙ্কীর্ণ, তাহাদের অধিকার ছিল না মোস্তফা-চরিত সঙ্কলন করিয়া মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করার। মূল ঘটনা যেসব গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে আমাদের উদ্ধৃত তথ্যসমূহ ঐসব গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত তথ্যসমূহ বাদ দিয়া, বরং উপেক্ষা করিয়া ঘটনাকে মনগড়ারূপে 'সম্ভবত' 'জনিত' ইত্যাদি নিজ উক্তির আড়ালে বিকৃত করা শিক্ষা ও সভ্যতার বিপরীত নহে কি?

ছিল। তাঁহারা রাখালকে কোন একটি ছাগী হইতে দুগ্ধদানের অনুরোধ করিলেন। আরবে এই নীতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল যে, পথিকগণ যেকোন মেষপাল ইত্যাদি হইতে নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

রাখাল বলিল, আমার পেষপালে দুগ্ধ দেওয়ার যোগ্য কোন ছাগী নাই; একটি ছাগী আছে, উহার বয়সও কম। এই শীত মৌসুমের আরম্ভে বাচ্চা দিয়াছিল। সেই বাচ্চা ছিল অসম্পূর্ণ দেহবিশিষ্ট, বহু দিন পূর্বে ঐ ছাগীটির দুগ্ধ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। নবী (সঃ) বলিলেন, ঐ ছাগীটিই নিয়া আস। উপস্থিত করা হইলে নবীজী (সঃ) স্তনে হস্ত বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন। উহার স্তনে দুগ্ধ নামিয়া আসিল। আবু বকর (রাঃ) একটি পাত্র নিয়া আসিলেন। নবীজী (সঃ) দোহন করিলেন। প্রথমবার আবু বকর (রাঃ) পান করিলেন, দ্বিতীয় বার ঐ রাখাল পান করিল– এইভাবে সকলে পান করিলে সর্বশেষে নবীজী (সঃ) পান করিলেন।

ঘটনাদৃষ্টে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, খোদার কসম! আপনি কে? আপনার ন্যায় ব্যক্তি ত আমি আর দেখি নাই। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার পরিচয় জ্ঞাত করিলে সংবাদ গোপন রাখিবে ত? সে বলিল, হাঁ। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)– আল্লাহর রসূল। রাখাল বলিল, কোরায়েশরা যাহাকে ধর্মত্যাগী বলিয়া থাকে আপনিই তিনি। নবী (সঃ) বলিলেন, তাহারা এরূপই বলিয়া থাকে। রাখাল বলিল, আমার স্বীকৃতি ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি নিশ্চয় নবী এবং আপনার ধর্ম সত্য; আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ তাহা করিতে সক্ষম হইবে না, আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করি। নবী (সঃ) বলিলেন, তুমি এখন আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না। আমার বিজয় ও প্রাবল্যের সংবাদ অবগত হইলে পর তুমি আমার নিকটে চলিয়া আসিও।* (বেদায়া, ৩–১৯৪)

একটি ঘটনা

আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা ত্যাগ করিবার পথে আমরা একটি গোত্রের বস্তিতে পৌঁছিয়া এক কুটিরে অবতরণ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঐ কুটিরে এক মহিলার অবস্থান। সন্ধ্যা বেলা তাহার পুত্র মেষপাল চরাইয়া উহা লইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে একটি ছুরি প্রদান করিয়া বলিলেন– এই ছুরি ও একটি মেষ লইয়া পথিক মুসাফিরদের নিকট যাও এবং বল, আপনারা এই মেষটি জবাই করিয়া নিজেরাও খওয়ার ব্যবস্থা করুন আর আমাদেরকেও দিন। মহিলার পুত্র ছুরি ও একটি ছাগী লইয়া পৌঁছিলেন। নবীজী (সঃ) ছুরি ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, দুগ্ধ দোহনের পাত্র নিয়া আস। বালক বলিল, ছাগীটিত কম বয়সের– এখনও পাঠার পালে আসে নাই * (ইহাতে দুগ্ধের সম্ভাবনা নাই)। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তুমি যাও; সে যাইয়া পাত্র নিয়া আসিল। নবী (সঃ) ছাগীটির স্তনে হাত বুলাইলেন, অতপর দুগ্ধ দোহাইলেন; পাত্রটি দুগ্ধে পূর্ণ হইলে উহা বালকের মাতার জন্য পাঠাইলেন। সে তৃপ্ত হইয়া পান করিলে পুনরায় দোহাইলেন। উহা সঙ্গীগণ পান করিলেন, সর্বশেষে নবীজী (সঃ) পান করিলেন। তথায় কাফেলা দুই রাত্র অবস্থান করিল। কুটির বাসীরা নবীজী (সঃ)-কে "মোবারক– বরকত ও মঙ্গলময়" নামে আখ্যায়িত করিল।

ঐ মহিলার মেষপালে বরকত হইল, উহা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া গেল। মহিলা তাহার মেষপালসহ পুত্রকে লইয়া মদীনায় পৌঁছিল। পুত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল মা! ঐ যে মোবারকের সঙ্গী ব্যক্তি। তাঁহারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে "মোবারক" নামে আখ্যা দিয়াছিল।

মাতা তৎক্ষণাৎ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

---

* পাঠক! "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনাকে কি বলিয়া স্বাভাবিক বানাইবে? ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হওয়ার কারণেই ত ঘটনায় উপস্থিত রাখাল স্পষ্ট বলিয়াছে, আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ করিতে পারে না।

* "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনায় ছাগীটির দুগ্ধ দেওয়ার স্বাভাবিকতা কিরূপে নির্ণয় করিবেন? উল্লিখিত দুইটি ঘটনা ঐসব কিতাবেই বর্ণিত রহিয়াছে যেসব কিতাব হইতে উম্মে মা'বাদের ঘটনা মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লাহর বান্দা! আপনার সঙ্গী সেই মহাপুরুষ কে ছিলেন, আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি আল্লাহর নবী। মহিলা বলিলেন, আমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে নবীজী (সঃ)-এর সমীপে পৌঁছাইয়া দিলেন; তাঁহারা নবীজী (সঃ)-কে কিছু পনির এবং গ্রাম্য সমগ্রী হাদিয়া পেশ করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলেন এবং পরিধেয় ইত্যাদি উপহার দিলেন। (যোরকানী, ১-৩৪৯, বেদায়া ৩-১৯২)

নূতন শুভ্র বসনে মদীনায় উপস্থিতির ব্যবস্থা

১৭০৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৪) যোবায়র (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) মদীনা যাওয়ার পথে যোবায়র রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত সাক্ষাত হইল- তিনি কতিপয় মুসলমান বণিকের সঙ্গে বাণিজ্য কাফেলায় সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। যোবায়র (রাঃ) নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)-কে সাদা কাপড়ের নূতন পোশাক পরাইয়া দিলেন।

মদীনার শহরতলীতে নবীজীর (সঃ) উপস্থিতি

মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার দিন-তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতভেদ আছে। সিদ্ধ মত ইহাই যে, হযরত (সঃ) রবিউল আউয়াল চাঁদের প্রথম তারিখ (বুধবার দিবাগত) বৃস্পতিবার রাত্রে মক্কা নগরী ত্যাগ করতঃ সওর পর্বত গুহায় পৌঁছিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাত্র হইতে রবিবার পর্যন্ত চারি দিন তিন রাত্র গুহার পথে এবং গুহায় উদ্‌যাপন করিয়া (রবিবার দিবাগত) সোমবার রাত্রে গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে মদীনায় পৌঁছিলেন। (ফতহুল বারী, ৭-১৮৮)

মক্কা হইতে মদীনায় পৌঁছিতে মদীনার শহরতলী কোবা পল্লী দিয়াই প্রবেশ পথ। এই কোবা পল্লীতে বনী আম্‌র ইবনে আওফ গোত্রের বসবাস। তাঁহাদের মহানুভবতা ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মক্কা হইতে বিতাড়িত ও আগত মজলুম অত্যাচারিত সর্বহারা মুসলমানগণ এই পল্লীর উক্ত গোত্রে বেশী পরিমাণে শুধু আশ্রয়ই পাইতেন না, বরং সহোদররূপে সমাদরে গৃহীত ও সযত্নে আপ্যায়িত হইতেন। মজলুম মোহাজেরগণের প্রথম ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র সর্বস্ব হইতে বিচ্ছিন্ন আবু সালামা (রাঃ) এই পল্লীতেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখিনী স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) শিশু পুত্রসহ দীর্ঘ এক বৎসর পর এই পল্লীতেই স্বামীর সহিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন। আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর সস্ত্রীক হিজরতকারী আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) তাঁহার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী, ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী সকলেই হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতে মোবাশ্‌শের ইবনে আবদুল মোনযের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (বেদায়া৩- ১৭১)

ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গ, ভ্রাতা, ভগ্নীপতিসহ বিশ জন সকলেই কোবা পল্লীতে রেফাআ, ইবনে আবদুল মোনযের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। (বেদায়া ২-১৭৩)।

হামযা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), আবু মারসাদ (রাঃ), মারসাদ (রাঃ),আনাছাহ (রাঃ) এবং আবু কাব্‌শা (রাঃ) তাঁহারও কোবা পল্লীতে কুলসুম ইবনে হাদম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-১৭৪)

নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা হইতে আত্মগোপন করিয়া যাত্রা করিয়াছেন- মদীনাবাসী মুসলমানগণ যথাসময়ে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অপরিসীম প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া

পড়িয়াছিল। সমগ্র শহর ও শহরতলীর মুসলমানদিগের আনন্দ-উৎসাহের সীমা ছিল না। কারণ তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া মদীনায় পৌঁছিবেন। মদীনার মুসলমানগণ প্রত্যহ নগর এলাকার বাহিরে উন্মুক্ত কাঁকরময় ময়দানে দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাকাইয়া থাকিতেন নবীজীর (সঃ) কাফেলার আগমন প্রতীক্ষায়। সূর্যের প্রখর উত্তাপই তাঁহাদিগকে সেই প্রতীক্ষা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিত সূর্য তাপ অসহনীয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা বাড়ী ফিরিতেন না।

১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিনও ঠিক ঐরূপেই মদীনাবাসী মুসলমানগণ সূর্য তাপে বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন মাত্র। ইতিমধ্যেই হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কোলাহল জাগিয়া উঠিল– উজ্জ্বল শুভ্র বসন পরিহিত ক্ষুদ্র কাফেলা মদীনার ঊর্ধ্বপ্রান্ত পথে কোবা পল্লীর পানে আগত পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরময় আনন্দ-উৎসাহের হিল্লোল বহিয়া গেল। মুসলমানগণ দলে দলে ঘর হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে আজ পুলক অফুরন্ত উল্লাস; দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ পূরণ হইবে– আল্লাহর রসূলকে আজ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন "ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম"।

ধীরে ধীরে নবীজীর (সঃ) কাফেলা কোবা পল্লীতে উপনীত হইল। বার রাত্র বার দিনের কঠিন সফরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে লইয়া একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। নবীজী (সঃ) মৌনভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পাশেই আছেন আবু বকর (রাঃ)। নবীজীর পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁকজমক নাই, উপবেশনে কোন পার্থক্য ও আড়ম্বর নাই– যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সহজে নবীজী (সঃ)-কে চিনিত পারিত। এমনকি যাঁহারা পূর্বে নবীজী (সঃ)-কে দেখেন নাই, আবু বকর (রাঃ)-কেও চিনিতেন না, তাঁহাদের অনেকে আবু বকর (রাঃ)-কে নবীজী মনে করিয়া তসলীম জানাইতেছিলেন। কারণ, আবু বকর (রাঃ) বয়সে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও তাহাকে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা অধিক বয়সের দেখাইত। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (সঃ) অভ্যর্থনাকারী ও সাক্ষাৎকারীগণের ভিড়ে যাতনা অনুভব করিবেন– অবলীলাক্রমে তিনি ঐভাবে তাহা হইতে রক্ষা পাইলেন। হয়ত এই কারণেই আবু বকর (রাঃ) তসলীম গ্রহণে বাধার সৃষ্টি না করিয়া মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় ছায়া সরিয়া যাওয়ায় নবীজীর চেহারার উপর রৌদ্র লাগিতে লাগিল। আবু বকর (রাঃ) অবিলম্বে নিজ বস্ত্রের সাহায্যে নবীজীর জন্য ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। ছায়া করাও হইল এবং ভক্ত-অনুরক্ত খাদেম ও প্রভুর মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ও হইয়া গেল।

বৃক্ষ ছায়াতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কুশলবাদ আলাপ-আলোচনার পর নবীজী (সঃ) কোবা পল্লীর কুলসুম ইবনে হদমের গৃহে আপ্যায়িত হইলেন। যে কয় দিন নবীজী (সঃ) কোবায় অবস্থান করিয়াছিলেন এই গৃহেই অবস্থান করিলেন, কিন্তু জনসাধারণের সহিত সাক্ষাত অনুষ্ঠানে তিনি সা'দ ইবনে খায়সামা (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে বসিতেন। কারণ, এই গৃহস্বামী ছিলেন পরিবার শূন্য; এই গৃহে নবীজীর নিকট লোকদের যাতায়াত ও সাক্ষাত সুবিধাজনক ছিল। (বেদায়া, ৩–১৯৭)

নবীজী (সঃ) মক্কা হইতে বাহির হইয়া আসায় কৃতকার্য হইলে পর আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষে সহজ হইয়া গেল নবীজীর নিকট মক্কাবাসীদের গচ্ছিত বস্তু তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া। সেমতে তিনি যথাসম্ভব দ্রুত মালিকদিগকে তাহাদের বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। মক্কা হইতে নবীজীর যাত্রা করার তিন দিন পরে আলী (রাঃ)ও মক্কা ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতেই নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের সহিত মিলিত হইলেন। (বেদায়া, ৩–১৯৭)

কোবা পল্লীতে নবী (সঃ) সোমবার পৌঁছিয়াছিলেন এবং শুক্রবার পর্যন্ত ঐ পল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা অবধারিত যে, কোবা হইতে নবীজীর প্রস্থান শুক্রবার ছিল; কাহারও মতে পরবর্তী শুক্রবার, কিন্তু অধিকাংশের মতে দ্বিতীয় শুক্রবার। সেমতে কোবা পল্লীতে নবীজীর (সঃ) অবস্থান (অবতরণ ও প্রস্থানের দিনকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় গণনা করিয়া) বার দিন ছিল। (বেদায়া, ৩ –১৯৮)

ছাহাবী আনাছ (রাঃ)- যাঁহার বয়স এই সময় মাত্র দশ বৎসর ছিল; তিনি পরবর্তীকালে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা নিজ স্মরণ অনুযায়ী প্রদান করিয়াছেন যে, কোবা পল্লীতে নবী (সঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহার স্মরণ মতে নবীজীর কোবা পল্লীতে অবতরণ শুক্রবার দ্বিপ্রহরে ছিল এবং তথা হইতে মদীনা নগরে প্রস্থান তৃতীয় শুক্রবার দ্বিপ্রহরের পূর্বে ছিল। সেমতে অবতরণ ও প্রস্থানের অর্ধ অর্ধ দিনের সমষ্টিকে একদিন গণ্য করিয়া চৌদ্দ দিন বলা হইয়াছে। (আসাহহুস সিয়ার- ১০৯)

কোবা পল্লীতে মসজিদ নির্মাণ

কোবা পল্লীতে ১২ দিন বা ১৪ দিন অবস্থান কালে নবীজী (সঃ) তাঁহার একটি বিশেষ আদর্শ ও সুন্নত বাস্তবায়ন করিলেন। নবীজীর (সঃ) বিশেষ মৌলিক আদর্শ ও সুন্নত এই যে, যেস্থানেই মুসলমানের বসবাস হইবে, তথায় সর্বদা জামাতের সহিত নামায আদায় করার সুব্যবস্থা করিবে। মুসলমানদের জন্য এই আদর্শ বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনেরও ইঙ্গিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ

অর্থ ঃ "মুসলমান এমন জাতি, তাহাদিগকে কোন ভূখণ্ডে শক্তি-সামর্থ্যের সুযোগ দান করিলে তাহারা তথায় নামায জারি করার সুব্যবস্থা করে...।"

কোবা পল্লীতে মুসলমানগণের মুক্ত ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সুযোগে মুসলমানদের কর্তব্য তথায় জামাতে নামাযের প্রচলন এবং ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ তৈয়ার করা। নবীজী (সঃ) তাঁহার ১২/১৪ দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে সেই কর্তব্যের উদ্বোধন করেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ ঐ কোবা পল্লীতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে তৈয়ার হয়। মুসলমান সর্ব সাধারণের জন্য এবং আনুষ্ঠানিক মসজিদরূপে পূর্ণ আকৃতিপ্রাপ্ত মসজিদ সর্বপ্রথম এই মসজিদে কোবা-ই ছিল। ইহার পূর্বে ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট নামাযের স্থানরূপে বা গোত্রীয় সমাজের নামাযের জন্য অতি সমান্য ঘেরাওয়ের রক্ষণায় নির্দিষ্ট নামাযের স্থান আরও তৈয়ার হইয়াছিল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকরূপে পূর্ণাঙ্গ জামে মসজিদ এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম কোবা পল্লীর এই জামে মসজিদই। উক্ত মসজিদের গৌরব পবিত্র কোরআনেও নিম্নরূপ উল্লেখা আছে-

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ـ

অর্থ ঃ "যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে পরহেজগারী- আল্লাহ অনুরক্তির উপর প্রথম দিন হইতে উহার সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয়। ঐ মসজিদের পল্লীবাসীরা (উত্তম লোক। তাহারা) পাক-পবিত্রতা ভালবাসিয়া থাকে। (পারা-১১, রুকু-২)

অনেকের মতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোবায় পদার্পণের প্রথম দিনেই এই মসজিদের ভিত্তি রাখিয়াছিলেন। (বেদায়া- ৩-২০৯)

কোবা মসজিদের ফযীলত

কোরআন শরীফে এই মসজিদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করিয়াছেন- এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহর তাক্ওয়া তথা পরহেজগারী ও আল্লাহ অনুরক্তির উপর। এই পল্লী হইতে চলিয়া যাওয়ার

পরও নবী (সঃ) এই মসজিদে আসিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রথম খণ্ড ৬৩১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে– নবী (সঃ) প্রতি শনিবার এই কোবা পল্লীর মসজিদে সুযোগ হইলে বাহনে নতুবা পদব্রজে আসিতেন এবং দুই রাকাআত নামায পড়িতেন।

হাদীছে আছে– এই মসজিদে নামায পড়িলে ওমরা আদায় করার সওয়াব লাভ হয়। (যোরকানী, ১–৩৫১)

কোবা হইতে মদীনার শহর পানে প্রস্থান

বার বা চৌদ্দ দিন কোবা পল্লীতে অবস্থানের পর শুক্রবার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার দাদার মাতৃকূল নাজ্জার বংশের লোকদিগকে তাঁহার মদীনা নগরীতে যাত্রার সঙ্কল্পের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন।

দীর্ঘ দুই সপ্তাহ আগ্রহ ও অপেক্ষায় কাটিয়া গিয়াছে! এখন নবীজীর (সঃ) আগমন সংবাদ পাইয়া নগরবাসীগণের আনন্দোল্লাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আর সীমা থাকিল না। তৎকালীন আরবীয় বীর জাতির প্রথানুসারে তাঁহারা সকলে তরবারি ঝুলাইয়া ফৌজী কায়দায় নবীজী (সঃ)-কে রাজকীয় অভ্যর্থনার সহিত নিয়া আসিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। নগরের মুসলমানদের মধ্যে এই শুভ সংবাদ অবিলম্বে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আবাল-বৃদ্ধ-বর্নিতা সকলে আনন্দে উল্লাসে মাতিয়া উঠিল।

শুক্রবার দিনের দীর্ঘ অংশ অতিক্রমের পর নবীজী (সঃ) কোবা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বনী সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌঁছিতেই জুমার নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। নবীজী (সঃ) তাঁহার একশত জন সঙ্গীসহ ঐ গোত্রের নির্দিষ্ট নামাযের স্থানে জুমার নামায আদায় করিলেন। নবীজীর (সঃ) জন্য ইহা সর্বপ্রথম জুমা ছিল।

নবীজী (সঃ)-এর সর্বপ্রথম জুমার খোতবা

উক্ত জুমায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খোতবার মর্ম নিম্নরূপ ছিল–

সমস্ত মহিমা-গরিমা একমাত্র আল্লাহর জন্য; আমি তাঁহার মহিমা গাহি ও প্রচার করি। আমি তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং (কর্তব্য পালনে ত্রুটির জন্য) তাঁহারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই। সৎ পথ লাভ তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করি। তাঁহার প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি। তাঁহাকে অমান্য করিব না। তাঁহাকে অমান্য করে এমন ব্যক্তিকে কখনও মিত্র বানাইব না। আমি এই সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; তিনি এক, তাঁহার অংশীদার কেহ নাই এবং এই সাক্ষ্যও ঘোষণা করিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রসূল। যখন দীর্ঘকাল যাবত বিশ্ব রসূল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে– যখন ধরাপৃষ্ঠ হইতে সত্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যখন মানব জাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে ডুবিয়া গিয়াছে, যখন বিশ্বের আয়ু শেষ প্রায় এবং কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সমাগত, কর্মফল ভোগের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী– এহেন সময় আল্লাহ তাঁহার রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-কে সত্যের জ্যোতি, জ্ঞানের আলো, সদুপদেশের আকর সঠিক ও বাস্তবমুখী ধর্ম দিয়া জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের অনুগত হইয়া চলিলেই মানব জীবনের চরম সফলতা লাভ হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের অনুগত হইয়া না চলিলে পদস্খলন, অপরাধ প্রবণতা এবং সুদূরপ্রসারী ভ্রষ্টতা অবধারিত।

হে জনমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি আমার চরম উপদেশ– তামরা তাক্‌ওয়া পরহেজগারী– আল্লাহ অনুরক্তি ও আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর (অর্থাৎ বিবেকের ঐ চরম উৎকর্ষতা লাভ কর যে, কুভাব-কুচিন্তা ও অপরাধ-প্রবণতার প্রবৃত্তিই হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়– ঐসব কদর্যের প্রতি এমন ঘৃণা জন্মে যে, তাহা স্বতই বিষবৎ পরিত্যজ্য বোধ হয়)।

পরকালের চিন্তা ও আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বনের উপদেশ– এক মুসলিম অপর মুসলিমকে দিবার মত

উৎকৃষ্টতর উপদেশ ইহাই। যেসব দুষ্কর্মে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁহার আযাবের ভয় দেখাইয়াছেন– সাবধান! তাহার নিকটেও যাইও না; ইহা আপেক্ষা উত্তম সদুপদেশ আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা অপেক্ষা উত্তম সতর্কবাণী আর কিছু হইতে পারে না। প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহকে ভয় করিয়া আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা– যাহাকে "তাক্‌ওয়া" বলে; এই তাক্‌ওয়াই হইল মানুষের জন্য পরকালের সাফল্য লাভে প্রকৃত সাহায্যকারী।

আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক এবং যে কর্তব্য রহিয়াছে– যেব্যক্তি সেই সম্পর্ক ও কর্তব্যকে ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-গোপনে ক্রটিমুক্ত ও নিখুঁত করিতে সচেষ্ট থাকিবে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে; ঐ ব্যক্তির এই প্রচেষ্টা তাহার জন্য ইহজীবনে অতি বড় সুনাম এবং পরজীবনে মহাসম্বল ও মহাসম্পদ হইবে– যখন মানুষের একমাত্র নির্ভরস্থল হইবে তাহার কৃত আমল। উল্লিখিত প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ দুনিয়ার বুকে যাহা কিছু করে, পরজীবনে সে শত আকাঙ্ক্ষা করিবে যেন হিসাব-নিকাশ হইতে অনেক অনেক দূরে থাকে।

আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে তাঁহার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াময় ও কৃপাময়। আল্লাহর কথা সত্য, তাঁহার অঙ্গীকার সুরক্ষিত ও অলঙ্ঘনীয়– সেই মহানই বলিয়াছেন, "আমার কথার রদবদল নাই, আমি বান্দাদের প্রতি আদৌ কোন অবিচার করিব না।"

ইহজীবন ও পরজীবন– উভয় জীবনের ব্যাপারে ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বতোভাবে আল্লাহর ভয়-ভক্তি সকলে অবলম্বন কর। যেব্যক্তি আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাসমূহ মুছিয়া ফেলিবেন এবং অতি বড় প্রতিদান তাহাকে দান করিবেন। যাহার ভিতরে আল্লাহর ভয়-ভক্তি থাকিবে সে চরম সাফল্য লাভ করিবে।

স্মরণ রাখিও, আল্লাহর ভয়-ভক্তি তাঁহার গজব হইতে রক্ষা করে, তাঁহার আযাব হইতে বাঁচায়, তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে হেফাযত করে। আরও আল্লাহর ভয়-ভক্তি চেহারা উজ্জ্বল করিবে, প্রভু-পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করিবে, মান-মর্যাদা ঊর্ধ্বে নিয়া যাইবে।

ইহজীবনের সুখ ভোগ কর, (কিন্তু ভোগের মোহে) আল্লাহর দাবী পূরণে শিথিল হইও না। আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার কিতাব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার (পর্যন্ত পৌঁছার) পথ সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবক আর কে মিথ্যাবাদী কপট, তাহাই আল্লাহ দেখিয়া নিবেন। সুতরাং আল্লাহ যেরূপ তোমাদের চরম উপকার করিয়াছেন তদ্রূপ তোমরাও নিজেদের উপকার কর– আল্লাহর শত্রুদের শত্রু গণ্য কর এবং তাঁহার (দ্বীনের) জন্য যথাযোগ্য জেহাদ কর। তিনি তোমাদিগকে (তাঁহার নিজের জন্য) নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তোমাদের নাম রাখিয়াছেন, মুসলিম– আত্মসমর্পনকারী।

(আল্লাহ তাআলা কিতাব ও পথের সন্ধান দানের সুব্যবস্থা এই উদ্দেশে করিয়াছেন–) যেন ধ্বংসের পথ অবলম্বনকারী সেই পথে ধ্বংস হয় সুস্পষ্টরূপে জানিয়া-বুঝিয়া লওয়ার পর। (ফলে তাহার কোন আপত্তির অবকাশ থাকিবে না।) এবং বাঁচিবার পথের সন্ধানী বাঁচিয়া যায় সুস্পষ্ট পথ পাইয়া। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কোন শক্তি নাই। অতএব সদা আল্লাহকে স্মরণ রাখিও, আর পরজীবনের জন্য সম্বল করিয়া লও। আল্লাহর সহিত নিজ সম্পর্ক যে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লয়, মানুষের সঙ্গে তাহার সমুদয় সম্পর্কের জন্য আল্লাহ তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যান। কারণ, মানুষের উপর আল্লাহরই হুকুম চলে– আল্লাহর উপর মানুষের হুকুম চলে না। মানুষ আল্লাহর উপর প্রভুত্ব রাখে না– আল্লাহই মানুষের উপর প্রভুত্ব রাখেন। আল্লাহু আকবর– আল্লাহ সর্বমহান; সেই মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও হস্তে কোন শক্তি নাই।

–(ওয়াকেদী ২–১১৭, বেদায়া ৩)

জুমা শেষে নগরের দিকে যাত্রা

জুমার নামায শেষ করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবার নগর পানে যাত্রা করিলেন। নবী (সঃ) তাঁহারই বাহনের উপর পিছনে আবু বকর (রাঃ)-কে বসাইলেন এবং ধীরে ধীরে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর হইতে মক্কার নীরব আকাবা প্রান্তরে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছিল, তিন মাস পূর্বেও সেই আকাবার গভীর নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারের আড়ালে গুপ্ত পরামর্শ করা হইয়াছিল যে, নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনায় আগমন করিবেন– আজ সেই পুণ্য প্রতিশ্রুতি সফল হইতে চলিয়াছে। মদীনার আনসার ও প্রবাসী মোহাজেরগণ বহু দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর নিজেদের আশাতীত সৌভাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন।

মুসলিম মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবীজীর প্রাঢালা অভ্যর্থনার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। বনু নাজ্জার বংশের সশস্ত্র লোকগণ নবীজীর কাসওয়া উষ্ট্রীর অগ্রে-পশ্চাতে এবং দক্ষিণে বামে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন রাজকীয় শান প্রদর্শনে। স্থানে স্থানে খঞ্জর ও বর্শা চালাইয়া যুদ্ধ মহড়া প্রদর্শনীর ধুম চলিয়াছে। সমগ্র নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গেল উৎসুক দর্শকদের ভিড়ে। এমনকি (তখন শরীয়তে পর্দার হুকুম ফরয হইয়াছিল না, তাই) অভিজাত মহিলারা পর্যন্ত নিজ নিজ গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া অনন্ত আবেগে তাকাইয়া ছিল নবীজীর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায়। সকলের অন্তরে আন্দ হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল নবীজীর আগমন আশায়। কী আনন্দ! কী আগ্রহ সকলের মনে! নর-নারী, ছোট-বড় সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহা আনন্দের আভা। বালক-বালিকাদের বিরামহীন ছুটাছুটি চলিয়াছে সড়কে সড়কে, গলিতে গলিতে। তাহারা দফ্ বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে সর্বত্র আনন্দ ধ্বনি দিতে লাগিল আল্লাহু আকবার, জাআ-মুহাম্মদ । মুহাম্মদের শুভাগমন– ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। আল্লাহু আকবার, জাআ রসূলুল্লাহ! –আল্লাহর রসূলের শুভাগমন।

সকলের অন্তরে আজ নব কৌতূহল, চেহারায় তাঁহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস, সম্মুখে তাঁহাদের কত কত রঙ্গীন স্বপ্ন; এই অতুলনীয় আনন্দ-উৎসবের মাঝে মহামানব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বহন করিয়া তাঁহার কাসওয়া উষ্ট্রী ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মদীনার বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রায় পাঁচ শত গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ আগাইয়া আসিলেন নবীজী (সঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য। শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ـ مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ـ مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعِ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا ـ جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

"মোদের পরে পূর্ণ চাঁদের হয়েছে উদয়
সানিয়াতুল-অদা* পথে দেখ্‌বি যদি আয়।
শোকর করব মোরা সদা সর্বজনে
ডাকবে যাবত ধরা পৃষ্ঠে কেহ আল্লাহ পানে*
মহান তুমি আস্‌ছ ধরায় মোদের শান্তি নিয়ে
বরণ করব তোমায় মোরা প্রাণ ঢেলে দিয়ে।
(যোরকানী, ১–৩৫৯, বেদায়া ৩–১৯৭)

---

* মদীনা নগরে প্রবেশ প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ পর্বতমালার একটি বিশেষ স্থান।

* অর্থাৎ যাবত আল্লাহর নাম তথা জগতের অস্তিত্ব থাকিবে।

মদীনা নগরে নবীজী (সঃ)

মদীনার রাজপথে নবীজীর বাহন চলিতেছে। কত মনের কত আকাঙ্ক্ষা! নবীজী (সঃ) আমাদের গৃহে অবতরণ করিবেন! প্রত্যেক গৃহ হইতে নবীজী (সঃ)-কে সাদর আহ্বান জানানো হইতেছিল। নবীজীর (সঃ) অন্তরে এই ইচ্ছা বিদ্যমান ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতামহের মাতুল বনু নাজ্জার গোত্রের কোন গৃহে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মান বর্ধিত করিবেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার মনোভাব মুখেও প্রকাশ করিয়াছেন–

اَنْزِلُ عَلٰى بَنِى النَّجَّارِ اَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُكْرِمُهُمْ بِذٰلِكَ ـ

অর্থ ঃ "পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করিব; এতদ্দ্বারা আমি তাঁহাদের সম্মান বর্ধিত করিব।" (মুসলিম শরীফ) কিন্তু বনু নাজ্জার গোত্রের লোকও ত অনেক। প্রত্যেকেই নবীজী (সঃ)-কে প্রাণঢালা সাদর অভিবাদন জানাইতেছিলেন। নবীজী (সঃ) সকলের সহিত সমব্যবহার প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহার অবতরণের ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। নবীজী (সঃ) সকলকে একই উত্তর দিতেছিলেন– "আমার উষ্ট্রীকে তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দাও, সে আল্লাহর আদেশে চলিবে, আল্লাহর আদেশে বসিবে; আল্লাহ আমাকে যথায় অবতরণ করাইবেন আমি তথায়ই অবতরণ করিব। নবীজী (সঃ) সবাইকে এই উত্তর দিতে লাগিলেন এবং উষ্ট্রীর লাগাম শিথিল করিয়া দিলেন। উষ্ট্রী ধীরে ধীরে চলিয়া নাজ্জার গোত্রীয় আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া বসিয়া পড়িল।

নবীজী (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপনজন (বনু নাজ্জার গোত্রের) কাহার গৃহ অধিক নিকটবর্তী? আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সর্বাধিক নিকটবর্তী আমার গৃহ এই আমার গৃহদ্বার। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, গৃহে যাইয়া আমাদের জন্য আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া আস। তৎক্ষণাত আবু আইউব (রাঃ) গৃহে গেলেন এবং সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাদের আরামের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছি। আপনি ও আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর বরকত ও মঙ্গলময়, আপনারা উভয়ে তশরীফ নিয়া চলুন। তাঁহারা সেই গৃহে তশরীফ নিয়া গেলেন। (বেদায়া ৩–২০০)

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এবং তাঁহার সহিত নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যিনি পূর্বেই হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন– উভয়ে নবীজীর (সঃ) আসবাবপত্র উঠাইয়া গৃহে নিয়া গেলেন। (যোরকানী, ১–৩৫৭)

বনু নাজ্জার বংশীয় কতিপয় বালিকা আনন্দে আত্মহারা হইয়া দফ্ বাজাইয়া আনন্দ গীত বা তারানা গাহিতে লাগিল–

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ ـ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارٍ ـ

"বনু নাজ্জার দুলালী মোরা আনন্দ মোদের চরম।
মুহাম্মদ মোদের পড়শী হলেন ভাগ্য মোদের পরম।"
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)

নবীজী (সঃ) তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে ভালবাস? তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কসম খোদার নিশ্চয় ইয়া রসূলাল্লাহ! নবীজী (সঃ) তাহাদের একবার উক্তির উত্তরে তিন বার বলিলেন, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসিব– আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমার অন্তর তোমাদেরে ভালবাসে (বেদায়া ৩–৩০০)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ছিল–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ـ

অর্থঃ "আমার উম্মতে শামিল নহে ঐরূপ ব্যক্তি যে ছোটদেরকে স্নেহ-মমতা ও আদর না করে এবং বড়দিগকে সম্মান না করে। (মেশকাত শরীফ, ৪২৩)

আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) গৃহে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের পিছনে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই –

ঐতিহাসিকদের অগ্রগণ্য মত হিসাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বেকার ঘটনা– তখন ইয়ামানের বাদশাহদের পদবী ছিল "তুব্বা", যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সেই "তুব্বা" পদবীর এক বাদশাহ– যিনি অতিশয় নেক ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি কোন এক ভ্রমণে মদীনার এলাকায় পৌঁছিলেন; ঐ এলাকা তখন অনাবাদী। সঙ্গী আলেমগণ, যাঁহারা আসমানী কিতাবের খাঁটি এলম রাখিতেন, তাঁহাদের মারফত তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই এলাকায়ই সর্বশেষ পয়গম্বর "মুহাম্মদ" (সঃ) নামীয় রসূলের হিজরতের স্থান হইবে।

বাদশাহ এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাত হইতে পারিয়া ঐ অঞ্চলে আলেমদের একটি দলের বসতি স্থাপন করিয়া তাহা আবাদ করিলেন এবং অখেরী যমানার পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ)-কে লক্ষ্য কলিয়া একখানা লিপিও লিখিলেন, যাহার মধ্যে তিনি হযরতের প্রতি স্বীয় ঈমান বিশ্বাস প্রকাশ করতঃ আখেরাতে তাঁহার শাফাআ'ত কামনা করিয়াছেন। পত্রখানা তথায় বসবাসকারী একজন আলেমের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহা স্বয়ং বা তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের পরম্পরা আখেরী যমানার পয়গম্বরের নিকট পৌঁছাইবার অসিয়ত করিয়াছিলেন।

সেই "তুব্বা" বাদশাহ হযরতের উদ্দেশে তথায় একটি বাড়ীও তৈয়ার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী সেই "তুব্বা" বাদশাহ কর্তৃক তৈয়ারী বাড়ীর স্থানেই অবস্থিত। এমনকি সেই বাদশাহর উল্লিখিত লিপিখানাও হযরতের হস্তে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। এক হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা "তুব্বা-কে মন্দ বলিও না; সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। (তফসীর রুহুল মাআ'নী, ২৫–১২৭)

কোবা পল্লী সম্পর্কীয় ঘটনাবলী বর্ণনায় একটি হাদীছ

১৭০৯। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে বাহির হইবার পরেই সারা মদীনায় খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনাপানে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। সেমতে মদীনার মুসলমানগণ প্রতিদিন ভোর হইতেই মদীনার বাহিরে আসিয়া হযরতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিতেন, এমনকি রৌদ্রের উত্তাপে প্রস্থানে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করিতেন।

একদিন তাঁহারা ঐরূপ অপেক্ষা করতঃ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি উঁচু টিলার উপর কোন আবশ্যকবশতঃ দাঁড়াইলে সে দূর হইতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে সাদা পোশাকে দেখিতে পাইল! ইহুদী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখা মাত্র অধীর হইয়া উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল– হে আরব বংশধরগণ! তোমাদের অদৃষ্টের শুভ চন্দ্র উদিত হইয়াছে– যাহার অপেক্ষা তোমরা করিতেছিলে। এই সংবাদ শুনামাত্র মুসলমানগণ ফৌজী কায়দায় সুসজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চলিল এবং মদীনার শহর প্রান্তের কাঁকরময় ময়দানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করিল।

হযরত (সঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া (মূল মদীনা শহরে আসিলেন না, বরং) ডান দিকের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া বনী আম্‌র ইবনে আওফ গোত্রের বস্তিতে অবতরণ করিলেন। সেদিন রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার

ছিল। সাক্ষাতকারী লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইলেন; রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মদীনাবাসী যাঁহারা পূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেন নাই তাঁহারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতপর যখন হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীরে রৌদ্র আসিবার দরুন আবু বকর (রাঃ) আগাইয়া আসিয়া স্বীয় চাদরের সাহায্যে হযরতের উপর ছায়া দানের ব্যবস্থা করিলেন তখন সকলে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামকে চিনিতে পারিলেন।

ঐ বস্তিতে হযরত (সঃ) দশ দিনের অধিক অবস্থান করিলেন এবং তথায় একটি মসজিদ তৈয়ার করিলেন। * সেই মসজিদটির প্রশংসাই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে যে, "এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ ভয়-ভক্তির উপর।" হযরত (সঃ) তথায় সেই মসজিদেই নামায পড়িয়া থাকিতেন। তারপর হযরত (সঃ) মূল মদীনায় পৌঁছিবার জন্য স্বীয় বাহনে আরোহণ করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্যান্য লোকগণ হযরতের (সঃ) পিছনে চলিতে লাগিলেন। হযরতের বাহন ঠিক ঐ স্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল যে স্থানে বর্তমানে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মসজিদ অবস্থিত। তথায় হযরতের পৌঁছিবার পূর্ব হইতেই কিছু সংখ্যক মুসলমান নামায পড়িয়া থাকিতেন এবং ঐ স্থানটি বস্তুত মদীনাবাসী দুই এতীম ছেলের মালিকানায় ছিল, ঐ স্থানে খেজুর শুকান হইত। হযরত (সঃ) ঐ স্থানটি তাহার মালিক ভ্রাতাদ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা বিক্রি করিব না, বরং ইহা আপনাকে বিনা মূল্যে হেবা করিয়া দিব (একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই ইহার বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখিব)। কিন্তু হযরত (সঃ) বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না, অবশেষে হযরত (সঃ) মালিকদ্বয়ের নিকট হইতে তাহা খরিদ করিয়া লইলেন, তারপর তথায় মসজিদ তৈয়ারের ব্যবস্থা করিলেন। মসজিদ তৈয়ারকালে ইট-পাথর বহন করিয়া আনার কার্যে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও শরীক হইয়াছেন এবং তিনি সেই ইটের বোঝা বহনকালে দুইটি বয়েত পড়িতেছিলেন–

هٰذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالُ خَيْبَرْ ـ هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرْ

"এই বোঝা জাগতিক ধন-দৌলতের বোঝা নহে; হে পরওয়ারদেগার! আমি বিশ্বাস করি, এই বোঝা দুনিয়ার ধন-দৌলতের বোঝা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান, অনেক পবিত্র।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةْ ـ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ ـ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের প্রতিদান-পুরস্কারই আসল, অতএব আনসার ও মোহাজেরগণের প্রতি দয়া করুন– (তাহাদিগকে সেই পুরস্কার প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করুন)।"

১৭১০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনার দিকে আসিতেছিলেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে ছিলেন। তিনি (বয়সে ছোট বটে, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে হযরত (সঃ) অপেক্ষা অধিক) বৃদ্ধ দেখাইতেন এবং তিনি বাহিরাঞ্চলের লোকদের নিকট পরিচিত ছিলেন (যেহেতু তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরিতেন)। পক্ষান্তরে হযরত (সঃ) বয়সে বড় হইয়াও বাহ্যিক আকৃতিতে আবু বকর অপেক্ষা অধিক) বলিষ্ঠ দেখাইতেন এবং তাঁহাকে সাধারণত লোকেরা চিনিত না। পথিমধ্যে লোকদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট হযরতের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত তিনি কে? তখন আবু বকর (শত্রুর ভয়ে গোপনীয়তা অবলম্বনে) বলিতেন, এই লোক আমাকে পথ দেখাইয়া থাকেন। জিজ্ঞাসাকারী ইহার অর্থ "সাধারণ জাগতিক পথ" গণ্য করিত; আর আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ করিতেন। এইভাবে আবু বকর (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে সত্যবাদী থাকিয়া মূল বিষয় গোপন রাখিতেন।

* সেই বস্তিটির নামই 'কোবা' তথায় এখনও সেই মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক সময় আবু বকর (রাঃ) পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া তাঁহাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতেছে। তখন আবু বকর (রাঃ) আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐ দেখুন এক অশ্বারোহী ঘাতক শত্রু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতেছে। তখন হযরত পিছনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, اللهم اصرعه ইয়া আল্লাহ! এই মানুষটাকে পাছড়াইয়া ফেলুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি (আবদ্ধরূপে) দাঁড়াইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। ঐ লোকটি বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমাকে যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। (আমাকে রক্ষা করুন)। হযরত (সঃ) তাহাকে বলিলেন, সম্মুখের দিকে আর অগ্রসর হইও না এবং আমাদের পিছনে যে কাহাকেও আসিতে দেখিবে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। (সে ব্যক্তি তাহাই করিল– কাহাকেও হযরতের তালাশে আসিতে দেখিলে সে বলিত, এই দিকে যাইতে হইবে না, আমি সব দেখিয়া আসিয়াছি।)

আবু বকর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কুদরত! যেব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শত্রু বা ভক্ষক ছিল, সে-ই দিনের শেষভাগে তাঁহার মিত্র ও রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল।

মদীনায় পৌঁছিয়া হযরত (সঃ) মূল শহরে আসিলেন না, বরং শহরের কিনারায় (কোবা নামক মহল্লায়) অবস্থান করিলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করার পর হযরতের (সঃ) মদীনা শহরে অবস্থান করিলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করার পর হযরত (সঃ) মদীনা শহরে অবস্থানকারী আনসারগণকে একদিন সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম আরজ করিয়া নিবেদন জানাইলেন আপনারা উভয়ে এখনই যানবাহনে আরোহণ করিয়া মদীনা শহরে চলুন; আমরা আপনাদের চির খাদেমরূপে আজ্ঞাবহ থাকিব। হযরত নবী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) বাহনে আরোহণ করিলেন। মদীনাবাসী আনসারগণ ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যস্থলে বেষ্টিতরূপে রাজকীয় শান-শওকতের সহিত মদীনায় নিয়া আসিলেন!

হযরত (সঃ) মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদীনা উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল– বাড়ী ঘরের ছাদ এবং উঁচু উঁচু টিলাসমূহের উপর হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভাগমন ধ্বনি গর্জিয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপ স্বতস্ফূর্ত উল্লাস ধ্বনির মধ্য দিয়া হযরত (সঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীর নিকটে আসিয়া অবতরণ করিলেন।

নবী (সঃ) আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপনজনের মধ্য হইতে কাহার বাড়ী নিকটবর্তী আছে? আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি উপস্থিত আছি; আমার বাড়ীই সর্বাধিক নিকটবর্তী– এই আমার ঘর এবং এই আমার বাড়ীর গেট। হযরত (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা– বাড়ী যাও এবং আমার জন্য আরাম করার ব্যবস্থা কর। আবু আইউব (রাঃ) (তাহা করিলেন এবং) বলিলেন, আপনারা উভয়ে [হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)] আমার বাড়ী তশরীফ নিয়া চলুন। আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করিবেন। সেমতে হযরত নবী (সঃ) আবু আইউবের গৃহে তশরীফ আনিলেন।

১৭১১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৯) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদীনা অঞ্চলে পৌঁছিলেন তখন প্রথম অবস্থায় তিনি মদীনার মূল শহরে আসেন না বরং তিনি মদীনার ঊর্ধ্ব প্রান্তে অবস্থিত বনু আম'র ইবনে আওফ গোত্রের (কোবা নামক) মহল্লায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় হযরত (সঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিলেন, অতপর (মদীনার সুপ্রসিদ্ধ গোত্র হযরতের দাদার মাতুল বংশ) বনু নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকগণকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা (হযরতের মনোবল দৃঢ় করার উদ্দেশে শান-শওকতের সহিত) ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সমভিব্যবহারে উটের উপর সওয়ার হইয়া মদীনা শহর পানে যাত্রা করিলেন। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকগণ হযরত (সঃ)-কে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া

রাখিয়াছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, সেই স্মৃতি এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

এইভাবে বিশেষ শান-শওকতের সহিত হযরত (সঃ) মদীনা শহরে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার বাহনটি আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (সঃ) (শহরে তথায় অবস্থান করিলেন এবং তিনি) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে যথায় থাকিতেন তথায় নামায আদায় করিয়া লইতেন। এমনকি বকরী রাখার ঘরেও তিনি আবশ্যকবোধে নামায পড়িয়া থাকিতেন (তখন মসজিদের কোন ব্যবস্থা ছিল না)। অতপর হযরত (সঃ) মসজিদ তৈয়ারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং (বর্তমান মসজিদে-নববীর স্থানটি ঐ সময় খেজুর বাগান ছিল, তাহা সম্পর্কে কথা-বার্তা চালাইবার উদ্দেশে) বনু নাজ্জার গোত্রের প্রধানদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই বাগানটির মূল্য কি চাও তাহা আমাকে বল। তাহারা বলিল, খোদার কসম আমরা মূল্য চাহি না, ইহার মূল্য আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট হইতে চাহি।

সেই বাগানটিতে ছিল কতিপয় মুসলিমের পুরাতন কবর এবং পুরান ঘর-বাড়ীর ভগ্নস্তূপ ও খেজুর বৃক্ষ। হযরত (সঃ) কবরগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন ভগ্নস্তূপগুলি সমান করিয়া ফেলিতে এবং খেজুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল এবং খেজুর বৃক্ষগুলিকে মসজিদের কেবলার দিকে সারিবদ্ধাকারে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরজার উভয় চৌকাঠ পাথরের তৈয়ার করা হইয়াছিল। সেই পাথর (এবং ইট ইত্যাদি) উঠাইয়া আনিবার সময় ছাহাবীগণ তারানা গাহিতেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের তারানা এই–

اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ اِلاَّ خَيْرَ الْاٰخِرَةْ ـ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ ـ

"হে আল্লাহ! পরকালের উন্নতিই একমাত্র উন্নতি, অতএব আনসার ও মোহাজের জামাতকে সেই পথে সাহায্য করুন।"

আবু আইউব (রাঃ)-এর গৃহে নবীজী (সঃ)

আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহ ছিল দ্বিতল। তিনি নবীজী (সঃ)-কে উপর তলায় অবস্থানের অনুরোধ করিলেন। আরজ করিলেন হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গীত; আপনার চরণ আমাদের মাথার উপর থাকিবে ইহাই অবধারিত। আমার পক্ষে সম্ভব নহে, আমি আপনার উপরে অবস্থান করিব। অতএব আমরা নীচের তলায় আসিয়া যাই, আপনি উপর তলায় তশরীফ নিয়া যাইবেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আবু আইউব! আমার এবং আমার সাক্ষাত প্রার্থীদের জন্য সুবিধাজনক ইহাই যে, আমি নীচের তলায় থাকি। অগত্যা তাহাই হইল। আবু আইউব পরিবার উপর তলায় এবং নবীজী মোস্তফা (সঃ) নীচের তলায় থাকিলেন।

রাত্রিবেলা উপর তলার একটি পানির পাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়া পানি ছড়াইয়া পড়িল। আবু আইউব (রাঃ) ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, নীচের তলায় পানি পড়িলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কষ্ট হইবে, তাই নিজেদের যে একমাত্র লেফ ছিল উহা সম্পূর্ণ ভিজাইয়া পানি মুছিয়া নিলেন।

এতদ্ভিন্ন আবু আইউব (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী এই ভাবিয়া ভীত থাকিলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপরে আছি, আমরা তাঁহার উপরে চলাফেরা করি! এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের এক কিনারায় সারা রাত্র বসিয়া থাকিলেন। ভোর বেলা নবীজী (সঃ)-কে সকল তথ্য অবগত করিয়া তাঁহাকে উপর তলায় যাইবার অনুরোধ করিলেন। নবী (সঃ) পূর্বের ন্যায় এইবারও সাক্ষাতপ্রার্থীদের সুবিধার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু আবু আইউব (রাঃ) উপরে থাকিতে কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে নবী (সঃ) উপর তলায় তশরীফ নিলেন, আবু আইউব পরিবার নীচের তলায় অবস্থান করিল।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহার্য তৈয়ার করিয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত করিলাম। নবী (সঃ) তাহা হইতে গ্রহণ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাইতেন। আমরা লক্ষ্য করিতাম পাত্রস্থ খাদ্যের কোন্ স্থানে নবীজীর আঙ্গুলের চিহ্ন দেখা যায়? আমি এবং আমার স্ত্রী ঐ বরকতপূর্ণ স্থান তালাশ করিয়া তথা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতাম। একদা আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হইলাম যে, পাত্রস্থ খাদ্যের কোন স্থানেই নবীজীর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায় না; মনে হয় নবীজী (সঃ) পাত্র হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি অতিশয় ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হইয়া খাদ্য গ্রহণ না করার হেতু জানিতে দরখাস্ত করিলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, এই খাদ্যে পেয়াজের গন্ধ ছিল। তাই আমি খাই নাই। কারণ আমাকে ফেরেশতার সঙ্গে আলাপ করিতে হয়; বিন্দুমাত্র দুর্গন্ধেও ফেরেশতাগণের কষ্ট হয়। তোমরা ঐ খাদ্য খাইয়া নাও। অতপর নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খাদ্যে আর কোন সময় পেয়াজ রসুন দেওয়া হইত না। (যোরকানী, ১-৩৫৮)

পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া সম্পর্কে মাসআলা ইহাই যে, যে সময় বা যেস্থানে ফেরেশতাগণের আনাগোনা থাকে বা লোকদের সহিত মেলামেশা হয়; ঐরূপ সময় ও ক্ষেত্রে পেয়াজ-রসুনের দুর্গন্ধ মুখে রাখিয়া উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। সেমতে পেয়াজ-রসুন খাইয়া মসজিদে বা নামাযে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি পেয়াজ-রসুন পূর্ণ পক্ব হয় যাহাতে দুর্গন্ধের লেশমাত্র নাই, তবে স্বতন্ত্র কথা।

আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে নবীজী (সঃ) অবস্থানকালে অন্যান্য ছাহাবীগণ নবীজীর জন্য খাদ্যসামগ্রী হাদিয়া দিয়া থাকিতেন। মদীনাবাসী যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ঐ সময় সর্বপ্রথম আমি হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। একটি পাত্রে দুধ ও মাখনে খণ্ড-বিখণ্ড রুটি ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাকে "ছরীদ" বলা হয়। আমি ঐ খাদ্যের পাত্র লইয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া আরজ করিয়াছিলাম, আমার মাতা এই খাদ্য হাদিয়া পাঠাইয়াছেন। নবী (সঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত মঙ্গল ও উন্নতি দান করুন।" অতপর উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া একত্রে ঐ খাদ্য খাইয়াছিলেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরে যাঁহার হাদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তিনি হইলেন সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)। তিনি গোশ্তের সুরুয়ায় ভিজানো রুটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতি দিনই বিভিন্ন ছাহাবীগণের খাদ্য হাদিয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উস্থিত হইয়া থাকিত। প্রত্যেক রাত্রেই দেখা যাইত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বারে তিন-চারি জন ছাহাবী খাদ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। (বেদায়া, ৩-২০২)

নবীজীর (সঃ) পদার্পণে মদীনা

মদীনা নগরীর পূর্ব নাম ছিল "ইয়াসরেব"। নবী (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাহার নাম "মদীনা" হইবে (দ্বিতীয় খণ্ড ৯৫৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। "মদীনা" অর্থ নগরী বা শহর। সেমতে নবীজীর আগমনের পরে সাধারণভাবে ইহাকে "মদীনাতুন নবী" বলা হইত; অর্থাৎ নবীর শহর। অতপর সংক্ষেপে শুধু "মদীনা" শব্দই থাকিয়া যায়। তাহার সহিত একটি গুণবাচক শব্দ মিলাইয়া বলা হয় "মদীনা মোনাওয়ারা" অর্থাৎ নূরে পরিপূর্ণ নগরী। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণে এই নগরীর প্রকৃত অবস্থার ইঙ্গিত তাহার আর একটি নামের দ্বারা পাওয়া যায়; সেই নামটি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্থির করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে আছে- জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি ان الله سمى المدينة طابة নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম 'তাবাহ' রাখিয়াছেন।

'তাবাহ' অর্থেই বিভিন্ন হাদীছে ইহার নাম 'তায়বাহ'ও উল্লেখ আছে। সাধারণভাবে গুণবাচক শব্দের সহিত এই নগরীকে "মদীনা তায়্যেবা"ও বলা হয়।

"তাবা, তায়বা ও তাইয়্যেবা" শব্দত্রয়ের এক অর্থ 'উৎকৃষ্ট', ভূপৃষ্ঠে মদীনা সত্যই সর্বোৎকৃষ্ট ভূখণ্ড। এমনকি অনেকের মতে নবীজীর আগমনে মদীনা মক্কা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত শব্দত্রয়ের আর এক অর্থ পাক-পবিত্র মদীনার ভূখণ্ডে মহা পবিত্রাত্মা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণে মদীনা এমন পবিত্র হইয়াছিল যে, ইহুদী মোনাফেকদের ন্যায় অপবিত্রদের তথায় সাময়িক অবস্থান সত্ত্বেও তাহা আল্লাহ তাআলার নিকট পবিত্র গণ্য হইতেছিল। এমনকি অপবিত্রদেরকে বাহির করিয়া দেওয়ার বৈশিষ্ট্য মদীনার ভূমিতে আল্লাহ তাআলা প্রদান করেন, যাহার বিকাশ সাধারণভাবে সময় সময় ক্ষেত্রবিশেষে ত হইয়াছেই; কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মদীনার এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে। এই তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৫ নং হাদীছে রহিয়াছে।

মদীনার সওগাত

আল্লাহ তাআলার রহমতে বিগত ১৯৬১ ইং সনে পবিত্র হজ্জের সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং ইসলাম ও ঈমানের প্রাণকেন্দ্র, মাহ্‌বুবে খোদার পবিত্র শহর সোনার মদীনায় হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে পবিত্র মদীনাকে স্মরণ করিয়া এবং তাজদারে মদীনা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে দরূদ ও সালাম পেশ করিয়া একটি আরবী কাসীদাহ পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বোখারী শরীফ চতুর্থ খণ্ড অনুবাদ লেখা হইতেছিল। পাঠকদের উপভোগের জন্য উক্ত কাসীদা "মদীনার সওগাত" নামে পেশ করিলাম।

أُحِبُّ الْاَرْضَ تَسْكُنُهَا سُلَيْمٰى - وَيَاتِيْهَا فُؤَادِىْ يُسْتَطَارُ

প্রিয় পাত্রের দেশ আমার নিকট বড়ই আদরণীয়, আমার অন্তর সেখানে উপস্থিত হইতে উড়িয়া আসে।

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِىْ - وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ حَوَتِ الدِّيَارُ

তথাকার দালান-কোঠা ইমারত ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু তথায় যিনি বসবাস করিতেন তাঁহার মহব্বতই আমাকে আকৃষ্ট করে।

نَعَمْ حُبُّ الدِّيَارِ اَرْضٍ - بِهَا الْمَحْبُوْبُ فِىْ قَلْبِىْ يَفُوْرُ

হাঁ হাঁ, যেই দেশ প্রাণাধিক প্রিয় পাত্রের দেশ, সেই দেশের প্রতিটি ঘর-দুয়ারের প্রতি মহব্বতও নিশ্চয় আমার অন্তরে উথলিয়া উঠে।

مَدِيْنَةُ طَيْبَةٍ نَفْسِىْ فِدَاهَا - بِهَا اٰثَارُ مَحْبُوْبٍ تُزَارُ

আমার জান-প্রাণ মদীনা তাইয়্যেবার উপর উৎসর্গ; সেখানে মাহবুবে খোদার বহু নিদর্শনের জেয়ারত লাভ হয়।

وَتُرْبَةُ طَيِّبَةٍ كُحْلٌ لِعَيْنِىْ - وَاَطْيَبُ لَايُضَاهِيْهَا الْعَبِيْرُ

মদীনা তাইয়্যেবার মাটি আমার চক্ষের সুরমা এবং আমার জন্য এরূপ সুগন্ধি যাহার মোকাবিলায় মেশ্‌ক-আম্বরও অতি তুচ্ছ।

وَتُرْبَتُهَا عَلٰى رَاْسِىْ وَعَيْنِىْ - وَلِىْ فِيْهَا السَّعَادَةُ وَالسُّرُوْرُ

উহার মাটি আমার মাথার উপর ও চোখের উপর রাখি, উহার স্পর্শে আমার সৌভাগ্য ও শান্তি নিহিত রহিয়াছে।

بِهَا دَارُ الْحَبِيْبِ حَبِيْبِ رَبِّىْ ـ وَاَنْوَارُ لَهَا دَوْمًا ظُهُوْرُ

তথায় মাহবুবে খোদার আবাসিক ঘর-বাড়ী রহিয়াছে এবং সর্বদা তথায় নূরই নূর প্রকাশ পাইতেছে।

وَقُبَّةُ رَوْضَةٍ خَضْرَاءُ تَزْهُوْ ـ عَلٰى شَمْسٍ وَّبَدْرٍ يَّسْتَنِيْرُ

তথায় আরও আছে মাহবুবে খোদার রওজা পাকের "সবুজ গম্বুজ", যাহার নূরানী উৎকর্ষ চন্দ্র-সূর্য হইতেও অধিক।

وَرَوْضَةُ جَنَّةٍ فِىْ دَارِ دُنْيَا ـ تَعَالَوْا فَاقْبَلُوْا بُشْرَى وَّزُوْرُوْا

তথায় আরও আছে ভূপৃষ্ঠে বেহেশতের বাগান। সকলে আসুন এবং তথায় প্রবেশের সুসংবাদ গ্রহণ করত তাহা স্বচক্ষে জেয়ারত করুন।

تَعَالَوْا فَادْخُلُوْهَا بِالسَّلَامِ ـ سُرُوْرُ وَابْتِهَاجُ وَّالْحُبُوْرُ

সকলে আসুন এবং সেই বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করুন। তথায় আনন্দই আনন্দ, শান্তিই শান্তি, সুখই সুখ।

تَعَالَوْا يَاعُصَاةُ يَاضِيَاعُ ـ فَبَابُ مُحَمَّدٍ مَلْجَى طَهُوْرُ

হে পাপী গোনাহগারগণ! হে নরাধমগণ! আস–আস; হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বার ও দরবার তোমাদেরকে আশ্রয় দান এবং পরিচ্ছন্ন করিবে।

فَبَابُ مُحَمَّدٍ مَلْجَى لِجَانٍ ـ وَمَاْوًى اِذْ تَرَاكَمَهُ الصَّغَارُ

তাঁহার দরজা গোনাহগারদের জন্য বিশেষ আশ্রয়স্থল এবং গোনাহগার যখন বিপদে বেষ্টিত হইয়া পড়ে তখন ঐ দরজা তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান।

وَبَابُ مُحَمَّدٍ مَاحِى الذُّنُوْبِ ـ وَلَوْ كَانَتْ تُعَادِلُهَا الْبُحُوْرُ

তাঁহার দরজায় উপস্থিত গোনাহসমূহ মুছিয়া দেয়, যদিও তাহা সমুদ্র পরিমাণ হয়।

وَمَنْ يَّاْتِىْ بِهٰذَا الْبَابِ يَوْمًا ـ سَيَغْفِرُ ذَنْبَهُ الرَّبُّ الْغَفُوْرُ

তাঁহার দরওয়াজায় যে ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, অচিরেই ক্ষমাশীল প্রভু আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

اَتَيْتُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْغِىْ ـ نَوَالَكَ مِنْ ذُنُوْنِىْ اَسْتَجِيْرُ

হে আল্লাহর রসূল! আপনার দরবারে আমি নরাধম হাযির হইয়াছি; আল্লাহর নিকট স্বীয় গোনাহের কুফল হইতে পানাহ চাহিতেছি, এ সম্পর্কে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করি।

اَتَيْتُكَ تَائِبًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ـ رَجَاءً لِلشَّفَاعَةِ هَلْ تُجِيْرُ

খোদার দরবারে সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করতঃ শাফাআ'তের জন্য আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি– আশা করি আপনি আশ্রয় দান করিবেন।

وَمَنْ لِىْ مِنْ هَلَاكِىْ يَوْمَ يَاتِىْ ـ صَحَائِفُ سُوْءِ اَعْمَالِىْ تَطِيْرُ

কেয়ামতের দিন যখন আমার বদ-আমলের আমল নামা উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পৌঁছিবে তখন অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবার উসিলা আমার পক্ষে আর কে হইবে–

سِوَاكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ - وَدُوْنَكَ يَاجَوَادُ يَابَشِيْرُ

আপনি ভিন্ন? আপনি সমস্ত গোনাহগারের পক্ষে শাফাআ'তকারী এবং দয়ার সাগর ও সুসংবাদ বহনকারী।

لَوَعْدُكَ بِالشَّفَاعَةِ حِرْزُ نَفْسِيْ - وَاَنَّكَ لَاتُخَيِّبُ مَن يَّزُوْرُ

আপনি স্বীয় উম্মতের শাফাআতের যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে রক্ষাকবচ। আপনারই ওয়াদা যে, আপনার (রওজা) জেয়ারতকারীকে কস্মিনকালেও বঞ্চিত করিবেন না।

عَلَيْكَ صَلٰوةُ رَبِّىْ وَالسَّلَامُ - دَوَامًا مَّايُقَلِّبُنَا الدُّهُوْرُ

যাবত এই বিশ্ব ভূমণ্ডলের যুগ চালু থাকিবে তাবত আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম চলিতে থাকিবে।

وَرَحْمَةُ رَبِّنَا الاَفُ اَلْفِ - عَلَيْكَ الدَّهْرَ يَابَدْرُ الْمُنِيْرُ

হে পূর্ণিমার চন্দ্র! বিশ্ব প্রভুর কোটি কোটি রহমত আপনার উপর চিরকাল বর্ষিত হইক–আমীন! আমীন!

নবীজী (সঃ)-এর আগমনে মদীনাবাসীদের উল্লাস

১৭১২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৮৮) মদীনাবাসী বিশিষ্ট ছাহাবী বরা-ইবনে আ'যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায়) আমাদের নিকট সর্বপ্রথম মোসআ'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মদীনার লোকদিগকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। অতপর বেলাল (রাঃ), সা'দ (রাঃ) এবং আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) আসিলেন। তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ছাহাবীদের কুড়ি জনের একটি দল লইয়া পৌঁছিলেন। তারপর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পৌঁছিলেন।

ছাহাবী বরা ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেন, আমি মদীনাবাসীগণকে কখনও কোন বস্তু দ্বারা ঐরূপ উল্লাসিত হইতে দেখি নাই যেরূপ উলসিত হইয়াছিলেন তাঁহারা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনে। এমনকি কচি-কাঁচা মেয়েরাও উল্লাসের সহিত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভাগমন-ধ্বনি দিতেছিল।

হিজরতের গুরুত্ব

ইসলামে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, হিজরতের দ্বারাই ইসলাম ও মুসলমানদের মুক্তি এবং শক্তির সূচনা হইয়াছে। হিজরতের পরেই মদীনাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বভৌমত্ব বিশ্ব বুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবই নহে শুধু, বরং বাস্তবায়িত হইয়াছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে এই হিজরতের গুরুত্ব অনেক বেশী; এমনকি এই মহান হিজরতকে মুসলমানদের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য ইসলামী বৎসরের গণনা হিজরত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৎসর গণনার প্রয়োজন সাব্যস্ত করা হইলে হিজরী সনের আরম্ভ সম্পর্কে আলোচনা হইল। কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজী (সঃ)-এর জন্ম হইতে আরম্ভের, কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজীর (সঃ) মৃত্যু হইতে আরম্ভের। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে হিজরত হইতে আরম্ভ করাই সাব্যস্ত হয়। নবীজীর (সঃ) হিজরতের সূচনা ছিল আকাবা গিরি কান্তারে মদীনাবাসীদের

তৃতীয় বায়আ'ত বা দীক্ষা গ্রহণ– যাহা জিলহজ্জ মাসের মধ্য দিকে হইয়াছিল; ঐ ভাঙ্গা মাসের পরবর্তী মাসই ছিল "মহররম"। তাই মহররম মাস হইতে বৎসর আরম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। হিজরতকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামী বৎসর গণনার বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৭১৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৬০) عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُّوا اِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ ـ

অর্থ ঃ ছাহাবী সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, সনের গণনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির সময় হইতে আরম্ভ করা হয় নাই এবং তাঁহার মৃত্যুকাল হইতেও আরম্ভ করা হয় নাই। মদীনায় তাঁহার হিজরত উপলক্ষ করিয়াই ঐ গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। অতপর আমরা ইনশা আল্লাহ তাআলা হিজরী সালের ভিত্তিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আলোচনা করিব।

হিজরী প্রথম বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইহুদী সম্প্রদায়ের ইসলামে প্রবেশ। মদীনায় ধন-দৌলত, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রথম নম্বরে ছিল ইহুদী সম্প্রদায়, পৌত্তলিকরা ছিল দ্বিতীয় নম্বরে। ইতিপূর্বে মদীনার আওস ও খাযরাজ পৌত্তলিক গোত্রদ্বয়ে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল, নবীজী (সঃ) মদীনায় পদার্পণ করিলে মন্থর গতিতে এবং নগণ্য সংখ্যায় হইলেও ইহুদী সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রবেশ করে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীদের বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ

১৭১৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৬) আনাছ (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় প্রবেশের ধারাবাহিক বিবরণ দানে বলিয়াছেন, নবীজী (সঃ) আবু আইউব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর) বাড়ীর নিকটে অবতরণ করিলেন।

এখানে হযরত নবী (সঃ) স্বীয় লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমতাবস্থায় (ইহুদীদের অন্যতম বিশিষ্ট আলেম) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাগানে ফল-ফলারি আহরণ করিতে থাকাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাত সেই আহরিত ফলের বোঝাসহ হযরতের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত হযরতের কথাবার্তা শ্রবণ করিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) পুনঃ হযরতের খেদমতে হাযির হইয়া ঘোষণা দিলেন, "আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল, আপনি সত্য দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হযরতের নিকট ইহাও আরজ করিলেন, ইহুদীগণ খুব ভালরূপেই জানে যে, আমি তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় একজন। আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং আমি তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম, আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।* আপনি ইহুদীদেরকে ডাকিয়া এই বিষয়টি যাচাই করিয়া দেখুন। তাহাদিগকে আমার সম্পর্কে

* আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই বক্তব্য ও প্রচেষ্টা স্বীয় অহঙ্কার প্রকাশার্থে ছিল না, বরং আসল উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের মধ্যে তাঁহার যে বাস্তব মর্যাদা ও উচ্চ স্থান রহিয়াছে তাহা হযরত (সঃ)-কে জ্ঞাত করা; যেন হযরত (সঃ) তাঁহার ইসলামের দ্বারা ইহুদীগণকে প্রভাবান্বিত করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরতের বিশেষ দৃষ্টির সৌভাগ্যও তিনি অধিক লাভ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করুন এর পূর্বে যে, তাহারা আমার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। কারণ, (ইহুদী জাতি মিথ্যা অপবাদে বড়ই পটু;) তাহারা যখন জানিতে পারিবে যে, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি তখন তাহারা আমার উপর দোষারোপ আরম্ভ করিবে।

সেমতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীগণকে সংবাদ দানের জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইহুদীগণ! তোমরা তোমাদের সর্বনাশা পরিণাম হইতে সতর্ক হও– তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, একমাত্র আল্লাই সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। নিশ্চয় তোমরা ভাল ভাবেই জ্ঞাত আছ যে, আমি আল্লাহর খাঁটি ও সত্য রসূল এবং আমি সত্য ধর্ম নিয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও। তাহারা উত্তরে বলিল, ইসলাম কি জিনিস তাহা আমরা জানি না, বুঝি না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে তিন বার তাহাদের এইরূপ কথা কাটাকাটি হইল। অতপর হযরত (সঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কিরূপ ব্যক্তি গণ্য হইয়া থাকেন? তাহারা বলিল, তিনি ত আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও সর্দার এবং সর্বাধিক বিজ্ঞ আলেম পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহার পিতাও তদ্রূপই ছিলেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, সেই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণকারী হয় তবে? তাহারা বলিল, আল্লাহর পানাহ– তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন– ইহা সম্ভবই নহে। হযরতের সঙ্গে তাহাদের এই বিতর্ক তিন বার হইল। (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নিকটেই লুকাইয়া ছিলেন।) হযরত (সঃ) বলিলেন, হে ইবনে সালাম! তুমি বাহির হইয়া আস। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইহুদীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ইহুদী জাতি! তোমরা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগাইয়া তোল। যেই আল্লাহ সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই; সেই আল্লাহর শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, তোমরা নিশ্চয় একনিষ্ঠরূপে জান এবং বুঝ যে, তিনি [নবী (সঃ)] আল্লাহর রসূল, তিনি সত্য ধর্ম বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহুদীগণ বলিল, আপনার এই কথা সত্য নহে।* অতঃপর (ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কায়) হযরত (সঃ) ইহুদীদেরকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

১৭১৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৬১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আগমনের সংবাদ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, যাহার সঠিক জ্ঞান একমাত্র নবীরই থাকিতে পারে–(১) কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত কি? (২) বেহেশত লাভকারীগণের আতিথেয়তা সর্বপ্রথম কি বস্তুর দ্বারা করা হইবে, (৩) সন্তান পিতার বা মাতার আকৃতি লাভ করার সূত্র কি?

হযরত (সঃ) বলিলেন, এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনই (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) জিব্রাঈল ফেরেশতা আমাকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলে, ইহুদীগণ ত জিব্রাঈলকে শত্রু মনে করিয়া থাকে। অতপর হযরত (সঃ) প্রশ্নগুলির উত্তর দান করতঃ বলিলেন, কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত হইল, একটি আগুন বাহির হইবে– সেই আগুনটি লোকদিগকে পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দিকে হাঁকাইয়া নিয়া চলিবে। আর বেহেশত লাভকারীগণের সর্বপ্রথম খাদ্যবস্তু হইবে একটি মৎস্যের কলিজার ছোট টুকরা। আর (গর্ভাশয়ের মধ্যে নর-নারীর উভয়ের বীর্য মিলিত হওয়ার সময়) পুরুষের বীর্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করে এবং নারী বীর্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করে।

---

* এক হাদীছে আছে, প্রথমে ইহুদীগণ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন– তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। আর তাঁহার ইসলাম প্রকাশের পর তাহারা বলিল, সে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সন্তান। তখন আবুদল্লাহ ইবনে সালাম (রঃ) বলিলেন; ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহুদীদের এই মিথ্যা অপবাদের ভয়ই আমি করিতেছিলাম। অর্থাৎ তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই অপবাদের ভয়েই। তাহাদের অপবাদ তাহাদের মুখেই মিথ্যা প্রমাণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তৎক্ষণাত বলিয়া উঠিলেন اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله "আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রসূল।

হযরত (সঃ)-এর নিকট ইহুদী আলেমগণের উপস্থিতি

মদীনায় হযরতের আগমন সংবাদ প্রচারিত হইলে পর তথাকার সংখ্যাগুরু, আধিপত্য ও প্রতিপত্তিশালী জাতি ইহুদীদের আলেমগণ– যাহারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব মারফত হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল, তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ ত সত্যকে সম্পূর্ণরূপে গোপন ও হজম করিয়া ফেলিল। তাহারা হযরত (সঃ)-কে পূর্ণরূপে চিনিয়া নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া সত্ত্বেও স্বীয় জ্ঞান-বিবেক এবং অন্তরের অটল সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করত তাঁহাকে অস্বীকার করিল। আর কিছু সংখ্যক ঐরূপও ছিল যাহারা উপরোক্ত দলের ন্যায় স্বীয় জ্ঞান-বিবেক ও অন্তরের অটল সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে না পারিয়া আপন লোকদের নিকট সত্য প্রকাশ করিল, কিন্তু স্বীয় সঙ্গীদের সমর্থন না পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কবলে পতিত হইয়া নিজের সিদ্ধান্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল। যেমন ইহুদীদের বিশিষ্ট গোত্র বনু নযীরের একজন সর্দার "আবু ইয়াসের ইবনে আখতাব" যে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিজ লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল– اطيعونى فان هذا النبى الذى كنا ننتظر "তোমরা সকলে আমার কথা মান, নিশ্চয় তিনি সেই নবী যাঁহার আবির্ভাবের অপেক্ষা আমরা করিতেছিলাম।" কিন্তু তাহার ভ্রাতা "হুয়াই ইবনে আখতাব" সেও তাহাদের অন্যতম বিশিষ্ট সর্দার ছিল, সে ভ্রাতার উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিল এবং সর্বসাধারণও তাহার সঙ্গেই হইয়া গেল। (ফতহুল বারী, ৭–২২০)

ইহুদী আলেমগণ যদি সমবেতভাবে তাহাদের উপলব্ধিকৃত সত্য উপেক্ষা না করিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে রসূলরূপে গ্রহণ করিয়া নিত তবে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিত। এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (সঃ) নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭১৬। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِيْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَاٰمَنَ بِيْ الْيَهُوْدُ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদীদের মধ্যে (তাহাদের আলেম শ্রেণীর দশ জন লোক এমন রহিয়াছে, সেই) দশ জন লোক আমার প্রতি ঈমান আনিলে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় আমার প্রতি ঈমান আনিত।

ব্যাখ্যা ঃ আলেমদের পদস্খলনে গোটা জাতিরই পদস্খলন হইয়া থাকে; সেই সূত্রেই আলেমদের ঘাড়ে মস্ত বড় দায়িত্ব এবং গোনাহের বোঝাও বড় হইবে, সুতরাং আলেমকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনার মূল শহরে পৌঁছিবার পর নবী (সঃ) মসজিদ তৈয়ারীর পকিল্পনা নিলেন, মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার আবাসিক গৃহ তৈয়ার হইবে এই ইচ্ছাও হয়ত তিনি পোষণ করিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মদীনা নগরীতে প্রবেশকালে নবীজী (সঃ) তাঁহার "কাসওয়া" উষ্ট্রীর উপর আরোহিত ছিলেন এবং নিজের অবতরণ সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছিলেন, উষ্ট্রী আল্লাহর হুকুমে চলিবে; যথায় ইচ্ছা বসিবে, তিনি তথায়ই

অবতরণ করিবেন। উষ্ট্রী আবু আইউব (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী নহে, বরং বাড়ীর নিকটবর্তী একটি উন্মুক্ত স্থানে বসিল। তখন নবী (সঃ) বলিয়াছেন, هذ المنزل ان شاء الله "ইনশাআল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে।"

অতপর উট হইতে অবতরণ করিতে নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন–

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে যে স্থানে অবতরণ করাইয়াছ উহাকে বরকতপূর্ণ করিয়া দাও; উত্তম স্থানে অবতরণ করানো তোমারই কাজ। (ওয়াফাউল ওয়াফ, ১–২৩০)

মসজিদ তৈরীর পকিল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত ভূখণ্ডকেই নবী (সঃ) মসজিদের জন্য নির্বাচন করিলেন। ঐ ভূখণ্ডের এক পার্শ্বে উট বাঁধা হইত, একদিকে খেজুর শুকানোর খলা ছিল, এক খণ্ডে প্রাচীন গোরস্থান ছিল, কিছু অংশে খেজুর বাগানও ছিল। ঐ ভূখণ্ডটির মালিক ছিল দুই জন এতীম বালক; তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদের অভিভাবক বিশিষ্ট ছাহাবী আস'আদ ইবনে যোরারা (রাঃ) সকলেই ঐ ভূখণ্ড মসজিদের জন্য বিনা মূল্যে দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু নবী (রাঃ) বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এমনকি ঐ ভূস্বামীদের গোত্র বনু নাজ্জার সকলেই উক্ত দান গ্রহণ করিতে নবীজী (সঃ)-কে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু নবী (সঃ) শেষ পর্যন্ত সম্মত হইলেন না। ভূখণ্ডের মূল মালিক দুই এতীম বালক, তাই এতীমের মালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেই হয় ত নবীজী (সঃ) তাহা বিনা মূল্যে গ্রহণের সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে এই ভূখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা হইল দশ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা এবং ঐ মূল্য আবু বকর (রাঃ) পরিশোধ করিয়াছিলেন। (ঐ ২৩১)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ কত সুন্দর ও কত সরল। মসজিদের ভূমি সংগ্রহ করিয়া মসজিদ নির্মাণ কার্য সম্পাদনে স্বয়ং নবীজী (সঃ) নিজে সামান্য দিনমজুরের মত ইট ও পাথরের মোট বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনসার ও মোহাজেরগণ কার্য সম্পাদনে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারা ছুটিয়া আসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِىُّ يَعْمَلُ ـ ذَاكَ اِذاً لَلْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ ـ

আমরা যদি বসিয়া থাকি আর নবী (সঃ) পরিশ্রম করেন, তবে ইহা জঘন্য ধৃষ্টতার কাজ। (ঐ ১৩৫)

নবীজীর (সঃ) সঙ্গী হইয়া ভক্ত ছাহাবীগণ মসজিদ তৈয়ার করিতেছেন– তাঁহাদের উৎসাহের সীমা আছে কী? আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া এই মোহাজরগণ সমবেত কণ্ঠে তারানা গাহিয়া যাইতেছিলেন; নবীজী মোস্তফা (সঃ)ও তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া উৎসাহ যোগাইবার জন্য সেই তারানা গাহিতেছিলেন। ১৭০৯ নং হাদীছে সেই তারানার দুইটি ছড়া এবং ১৭১১ নং হাদীছে আর একটি ছড়ার উল্লেখ হইয়াছে।

নবীজী (সঃ) এবং ছাহাবীগণের সমবেত প্রচেষ্টায় মসজিদ নির্মিত হইল। এই প্রথম নির্মাণকালে মসজিদটির দৈর্ঘ্য সত্তর হাত, প্রস্থ ষাট হাত, উচ্চতা সাত হাত ছিল। পবরর্তীকালে নবীজীর (সঃ) আমলেই প্রয়োজনবোধে এ মসজিদের প্রথম সম্প্রসারণ হয়– দৈর্ঘ্যে একশত হাত, প্রস্থেও একশত হাত।

(ওয়াফাউল ওয়াফা– ১)

মূল মসজিদ তৈয়ারীর পর এক সময় নবীজী (সঃ) মসজিদ সংলগ্ন উহার একটি বারান্দাও তৈয়ার করেন। এক বর্ণনায় ঐ বারান্দা তৈয়ারীর সময়কালও নির্ণীত হয়। মসজিদ যখন তৈয়ার হয় তখন নামাযের কেবলা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে, যাহা মদীনা হইতে উত্তরে। হিজরতের ১৬ বা ১৭ মাস পরে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়া নামাযের কেবলা কা'বা শরীফের দিকে নির্ধারিত হয় । যাহা মদীনা হইতে দক্ষিণ দিকে। এইভাবে বিপরীত দিকে কেবলা পরিবর্তিত হইলে মসজিদেরও সম্মুখ-পশ্চাৎ পরিবর্তিত হয়। প্রথমে মসজিদের সম্মুখ তথা কেবলা দেওয়াল ছিল উত্তর দিকস্থ দেওয়াল। কেবলা পরিবর্তন হইলে মসজিদের

সম্মুখ হইয়া যায় দক্ষিণ দিকের দেওয়াল এবং স্বভাবতই মসজিদে প্রবেশ পথ উত্তর দিকের দেওয়ালে করিতে হয়। এই সময় উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে খেজুর পাতার একখানা চাল সংযোগ করিয়া সম্মুখ দিকে উন্মুক্ত একটি বারান্দা বা চাতাল তৈয়ার করা হয় (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১-৩২১)।

উল্লিখিত চাতাল বা বারান্দাকেই আরবি ভাষায় "সোফ্‌ফা" বলা হয়। নিঃসম্বল, নিঃস্ব, নিরাশ্রয় সর্বহারা মুসলমান- মদীনাতে যাহাদের কোন আপনজন বা আশ্রয়স্থল নাই, এই শ্রেণীর লোকদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নবীজী (সঃ) ঐ বারান্দা তৈয়ার করিয়াছিলেন। "সোফ্‌ফা" অর্থ বারান্দা, এই সূত্রেই তথায় আশ্রয় গ্রহণকারীগণকে "আসহাবে সোফ্‌ফা বা বারান্দার আশ্রিত" আখ্যায় স্মরণ করা হইত।

এই অস্থায়ী আশ্রয় জীবনে বিভিন্ন সূত্র সমন্বয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হইত। তাঁহারা নিজেরাও জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া কিছু জোটাইতেন এবং খেজুর বাগানের মালিক আনসারগণও নিজ নিজ সাধ্যমতে কিছু খেজুরের ছড়া মসজিদে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আর নবী (সঃ) নিজে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ নিজ নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে মেহমানরূপে নিয়া যাইতেন। নিঃস্ব নিঃসম্বল হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক দুর্বলতা ছিল চরম, তাই তাঁহাদের পরিধেয়ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইত। পারিবারিক জীবনের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সাংসারিক কোন ব্যস্ততা হইত না। তাঁহারা এই সুযোগ এক মহান কাজে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা সর্বদা নবীজী (সঃ)-এর সঙ্গে চাপিয়া থাকিয়া দ্বীনের শিক্ষা কোরআন-হাদীছের চর্চায় লিপ্ত থাকিতেন। মদীনার বাহিরে কোথাও শিক্ষকের চাহিদা হইলে নবী (সঃ) তাঁহাদের হইতেই শিক্ষক পাঠাইতেন।

স্মরণ রাখিবেন, মসজিদে নববীর এই বারান্দায় আশ্রয় লাভকারী আসহাবে সোফ্‌ফাগণ কোন স্থায়ী ও বিশেষ সম্প্রদায় ছিল না- যেরূপ হইয়া থাকে হিন্দুদের মধ্যে যোগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী বা ভিক্ষু সম্প্রদায়।

নবীজীর (সঃ) সুন্নত, ইসলামের আদর্শ পারিবারিক জীবন লাভের সংস্থান সাপেক্ষে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণরূপে তাঁহারা ঐ বারান্দায় আশ্রয় লইতেন। আদর্শগত সাধারণ জীবিকার সুযোগ যখনই যাঁহার লাভ হইত তখনই তিনি ঐ আশ্রয় হইতে কাটিয়া পড়িতেন। আসহাবে সোফ্‌ফাগণের স্বরূপ নির্ণয়ে মদীনার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ "ওয়াফাউল ওয়াফা" গ্রন্থে বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) হইতে উদ্ধৃতি বিদ্যমান আছে-

الصفة مكان فى مؤخر المسجد النبوى مظلل اعد لنزول الغرباء فيه ممن لاماوى له ولا اهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم او يموت او يسافر.

অর্থাৎ "সোফ্‌ফা" একটি বিশেষ স্থান, যাহা মসজিদে নববীর পিছনে (কেব্‌লার দিকের বিপরীত দিকের প্রান্তে)উপরে চাল বা ছাপ্পর দেওয়া ছিল। গরীব দুস্থ, যাঁহাদের ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন না থাকিত, ঐরূপ লোককে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশে উহা তৈয়ার করা হইয়াছিল। তথায় আশ্রয়ীগণের সংখ্যা সময়ে বেশী, সময়ে কম হইত এইভাবে যে, তাঁহাদের কেহ বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনের সংস্থান করিয়া লইতেন, কাহারও মৃত্যু হইত, কেহ অন্যত্র চলিয়া যাইতেন।

সারকথা, সোফ্‌ফা বা এ বারান্দায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করা মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, সাময়িক আশ্রয় দানের ব্যবস্থা ছিল মাত্র। তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী সকলেই সুযোগ মতে সাধারণ জীবন যাপনে চলিয়া যাইতেন। আসহাবে-সোফ্‌ফাগণের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি পরবর্তী জীবনে এক প্রদেশের গভর্ণরও হইয়াছিলেন।

তৎকালীন মসজিদে নববী

ইসলাম বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে না, সর্বক্ষেত্রে সরলতাই ইসলামের আদর্শ। তদুপরি ঐ যুগে বিশেষতঃ মরু অঞ্চল মক্কা-মদীনায় লোকদের সাধারণ আবাস গৃহও অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানেরই ছিল।

সেমতে মসজিদে নববীর নির্মাণও ঐ শ্রেণীর ছিল। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের আড়া ও খুঁটি এবং খেজুর পাতার ছাপ্পর, বৃষ্টি হইলে পানি ঝরিত। এই ছিল তৎকালীন মসজিদে নববীর আকৃতি (বাংলা বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ২৯১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে ছিল না কোন সমুচ্চ গুম্বজ, ছিল না সুদীর্ঘ মিনার।*

অনাড়ম্বররূপে তৈয়ারী ঐ মসজিদটি নবীজীর গুরুত্বপূর্ণ জীবনের দশটি বৎসর এবং তাঁহার পরেও খলীফাগণের আমলে শুধু কেবল নামায বা এবাদতের স্থানই ছিল না; বরং এই মসজিদই ইসলামের সর্বপ্রকার জরুরী কার্যের প্রধানতম বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এমনকি বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর ফরমান জারির কেন্দ্রও এই মসজিদই ছিল এবং এই খেজুর পাতার মসজিদেরই এত বড় প্রভাব ছিল যে, উহার সম্মুখে আসিলে পারস্য ও রোম মহাদেশের রাজদূতগণের কলিজাও কাঁপিয়া উঠিত।

নবীজী (সঃ)-এর আবাসিক গৃহ তৈয়ার

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নবীজীর উষ্ট্রী ঐ স্থানে বসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন– ইনশা-আল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে। তাই মসজিদ তৈয়ারর পরেই নবীজী (সঃ) তাঁহার সেই সঙ্কল্প বাস্তবায়ন করিলেন। ঐ সময় নবীজীর সহধর্মিনী ছিলেন দুই জন– সওদা (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)। অবশ্য আয়েশা (রাঃ)

তখনও নবীজীর গৃহিণী হইয়াছিলেন না। কিন্তু নবীজীর কন্যাগণ ত ছিলেন। তাই নবীজী (সঃ) মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদেরই সমান সামনে কাঁচা ইট এবং খেজুর গাছ ও পাতার দুইটি কক্ষ তৈয়ার করিলেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজনমত আরও নয়টি কক্ষ তৈয়ার করিয়াছিলেন; কক্ষগুলি সবই মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল, অবশ্য মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে কোনে কক্ষ ছিল না। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১–৩২৫)

নবীজীর কক্ষগুলি কাঁচা ইট, খেজুর গাছের খুঁটি ও আড়া এবং খেজুর পাতার উপর মাটি ফেলিয়া ছাদ– এই আকৃতিতে তৈয়ার ছিল। দরজায় মেষের লোমে বুনা চট ঝুলানো ছিল। এই ছিল সরদারে দো-জাহান বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গৃহের আকৃতি– যথায় তিনি সারা জীবন পরিবার পরিজন নিয়া বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কত কত এলাকা তিনি জয় করিয়াছিলেন, তথাকার ধন-সম্পদ হস্তগত করিয়াছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার গৃহ ঐ আকৃতিরই ছিল। প্রায় শতাব্দীকালের পর ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসন আমলে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ প্রয়োজন হইলে ঐ কক্ষসমূহ ভাঙ্গিয়া মসজিদ বর্ধিত করা হইয়াছে।

কক্ষসমূহ উচ্ছেদ উপলক্ষে ছাহাবী তনয় তাবেয়ীগণের অনেকে মসজিদে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন– "কক্ষগুলি বিদ্যমান রাখিতে পারিলে কত ভাল হইত। পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ লাভের সুযোগ হইত তাহারা বাড়ী-ঘরের মান নিম্নের রাখিত; তাহারা দেখিতে পাইত– আল্লাহ তাঁহার নবীর জন্য কিরূপ বাসস্থান পছন্দ করিয়াছিলেন। অথচ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে বিশ্ব ধনভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ প্রদত্ত ছিল।" (ঐ ৩২৭)।

মক্কা হইতে নবীজী (সঃ)-এর পরিবারবর্গ আনয়ন

মসজিদ এবং উহার সঙ্গে আবাস গৃহের দুইটি কক্ষ তৈয়ার হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয়

* কবি গোলাম মোস্তফা সঙ্কলিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থের বিবরণ– "চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল, ইহার সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে বাস্তবিকই এক নূতন শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইত।"

উক্ত গ্রন্থের এই সব বর্ণনাদৃষ্টে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ে; আয়াতটির মর্ম হইল– "তোমরা লক্ষ্য কর না কবিগণ হর রকম ময়দানেই (এমনকি শুধু কল্পনার ময়দানেও চক্কর খাইতে থাকে। (পারা– ১৯, রুকু– ১৫)।

পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এবং বিশিষ্ট খাদেম আবু রাফে'কে মক্কায় প্রেরণ করিলেন উম্মুল মোমেনীন সওদা (রাঃ) এবং তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম ও কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমা জোহরাকে নিয়া আসিবার জন্য। হযরতের দ্বিতীয় কন্যা রোকাইয়া (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ্য কন্যা তখনকার অমুসলিম স্বামী আবুল আ'ছের নিকট আবদ্ধ ছিলেন, আর উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) স্বীয় পিতা আবু বকরের (রাঃ) পরিবারবর্গের সঙ্গেই ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে মক্কায় পাঠাইলেন স্ত্রী উম্মে রুমান, পুত্র আবদুর রহমান এবং কন্যা আস্‌মা ও উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ)-কে নিয়া আসিবার জন্য।

হযরতের পরিবারবর্গ মদীনায় পৌঁছিলে হযরত (সঃ) আবু আইউব আনসারীর গৃহ ত্যাগ করতঃ মসজিদ সংলগ্ন তৈয়ারী স্বীয় বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

মদীনায় নবীজী (সঃ) কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব পালন ও প্রতিষ্ঠা উভয়টি ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দাসত্ব পালন হইল প্রথম নম্বরে, আর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা হইল দ্বিতীয় নম্বরে। তাই ইসলামের মক্কী জীবনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই, এমনকি জেহাদের অনুমতিও দেওয়া হয় নাই। অবশ্য মুসলমানকে আল্লাহর দাসত্ব পালনের সুযোগপ্রাপ্তির সাথে সাথে উহা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং পরিকল্পনাও গ্রহণ করিতে হয়। মক্কায় আল্লাহর দাসত্ব পালনেরই সুযোগ ছিল না। মদীনায় আসার পর নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এমনকি আল্লাহর দাসত্ব পালনে এবাদত বন্দেগীর কেন্দ্র মসজিদও নবীজী (সঃ) তৈয়ার করিয়া সারিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার কর্ম পরিকল্পনা এত দ্রুত ধাবমান করিলেন যে, বিরতিহীনরূপে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আল্লাহর দাসত্ব পালনের সুযোগপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করিয়া যাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াই নবীজী (সঃ) তাহার প্রতিষ্টার চেষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (সঃ) এই পকিল্পনায় সর্বপ্রথম মদীনা এলাকাকে গৃহযুদ্ধমুক্ত শান্তির এলাকায় পরিণত করার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকিলে কোন কাজেরই অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয় না। এই পদক্ষেপে নবীজী (সঃ) মদীনার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।

মদীনার আদি অধিবাসীর পৌত্তলিক গোত্রগুলিতে ইসলামের প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে মুসলমানগণ প্রবল ছিলেন– যাঁহারা আনসার নামে আখ্যায়িত ছিলেন। আর এক শ্রেণী ছিলেন প্রবাসী মুসলমান, মদীনায় তাঁহাদেরও সংখ্যা যথেষ্ট ছিল; তাঁহারা মোহাজের নামে আখ্যায়িত ছিলেন। মদীনার আদি অধিবাসী আর এক সম্প্রদায় ছিল ইহুদী; নবীজীর (সঃ) আগমনের পূর্বে মদীনায় তাহাদেরই প্রাবল্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

মুসলমানদের দুই শ্রেণী– আনসার ও মোহাজের এবং ইহুদী সম্প্রদায়, এই তিন শ্রেণীকে নবী (সঃ) সহাবস্থান ও মদীনার দেশরক্ষা চুক্তিতে এক করার ব্যবস্থা করিলেন।

আনসার মোহাজের ও ইহুদীদের মধ্যে সহাবস্থান চুক্তির ঐতিহাসিক সনদ সম্পাদন

সনদটির শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ–

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহা কোরায়শ বংশীয় (প্রবাসী বা মোহাজের) মুসলমান আর মদীনাবাসী মুসলমান এবং তাঁহাদের সহিত যাহারা দেশরক্ষা ও শান্তি অভিযানে অংশগ্রহণ করিবে– সকলের মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক সম্পাদিত সনদ।

সনদটির সর্বপ্রথম অনুচ্ছেদ ছিল এই-

"স্বাক্ষরকারী সকল দল অন্য সকলের মোকাবিলায় এক গণ্য হইবে।" অর্থাৎ চুক্তি বা সনদের মর্ম ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উহার বিরোধীদের মোকাবিলায় স্বাক্ষরকারীগণ অভিন্নরূপে সংগ্রাম করিবে।

অতপর সনদের মধ্যে অনেক অনুচ্ছেদই ছিল, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতিপয় অনুচ্ছেদ এই-

১। ইহুদী সম্প্রদায়- যাহারা আমাদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরে যোগ দিয়াছে, তাহাদের জন্য সাহায্য এবং (নাগরিকত্বের) সমান সুযোগ থাকিবে। তাহাদের কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে তাহার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করা হইবে না।

২। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইহুদীদের সপক্ষে আরও একটি ধারা ছিল, তাহারা নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পাইবে।

৩। ইহুদীদের কেহ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারিবে না।

৪। সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কাহারও আক্রমণ হইলে অন্য স্বাক্ষরকারীগণ ঐ সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহায়তা করিবে। অবশ্য অন্যায়ের ক্ষেত্রে কোন সাহায্য করা হইবে না।

৫। স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মুসলমানদের ন্যায় ইহুদীগণও ব্যয়ভার বহনে বাধ্য থাকিবে- যাবত যুদ্ধ চলিতে থাকে।

৬। স্বাক্ষরকারী এক মিত্র অপর মিত্রকে তাহার অন্যায়ে সাহায্য করিবে না, সর্বক্ষেত্রে অত্যাচারিতের পক্ষে সাহায্য থাকিবে।

৭। স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় সমবেতভাবে ইয়াসরেব (মদীনা) এলাকাকে রক্ষা করিতে এবং অপরাধমুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

৮। স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় মক্কার কোরায়শদের বা তাদের কোন মিত্রকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না।

৯। সকল মোমেন মোত্তাকী ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত থাকিবে, যে অবাধ্য হয় কিম্বা অত্যাচার, অপরাধ, সীমা লঙ্ঘন বা মোমেনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় ঘটানোর কাজে লিপ্ত হয়। মোমেনদের ঐক্যবদ্ধ হস্ত ঐ শ্রেণীর লোককে শায়েস্তা করায় সক্রিয় থাকিবে- যদিও ঐ লোক তাহাদের কাহারও নিজ সন্তান হয়।

১০। (কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপনে আনসার ও মোহাজের-) সকল মুসলমানের মৈত্রী এক হইবে। বিশেষতঃ জেহাদের বেলায় মুসলমানদের একজনকে ছাড়িয়া অন্যজন কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে এরূপ মৈত্রী স্থাপন করিবে যাহা সকলের স্বার্থ রক্ষায় সমান হয় এবং সকল মুসলমানের পক্ষে ন্যায় হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের কোন এক জামাত অন্যদেরকে ছাড়িয়া বা সকল মুসলমানদের স্বার্থ সমানভাবে না দেখিয়া শুধু এক দলের স্বার্থের জন্য কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না।

১১। এই সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান- যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদের কেহ কোন ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর সহায়তা করিতে পারিবে না, তাহাকে সমর্থন দিতে পারিবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কেহ সাহায্য সমর্থন দিলে তাহার উপর আল্লাহর লা'নত ও গযব পড়িবে এবং তাহার ফরয নফল কোন প্রকার এবাদত কবুল হইবে না।

১২। সনদের কোন বিষয়ে কোন বিতর্কের সূত্রপাত হইলে উহার মীমাংসা একমাত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর ন্যস্ত হইবে।

১৩। স্বাক্ষরকারী মিত্রদের কোন সম্প্রদায়ে এমন কোন বিবাদের সৃষ্টি হইলে- যাহার প্রতিক্রিয়া ছড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাদের সমাপ্তি আল্লাহর এবং আল্লাহ রসূল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার আদেশে প্রাপ্ত যে মীমাংসা ও সালিস করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত ও সকলের গ্রহণীয় সাব্যস্ত হইবে।

সনদের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ ছিল এই–

আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সঃ) ঐ ব্যক্তির সাহায্য সমর্থনে থাকিবেন যে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে এবং সৎ-সাধু হইয়া জীবন যাপন করিবে। (সীরতে ইবনে হেশাম এবং বেদায়া, ৩–২৪৪)

এই সনদ সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামের এমন একটি রূপের বিকাশ হইল যাহা সম্পর্কে এত দিন কোন ধারণা করা যায় নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায়, সমাজ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামী নীতির রূপরেখা কি হইবে তাহা এত দিন অপ্রকাশিত ছিল। কারণ ইসলাম এত দিন আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিল; নীতিমালার প্রকাশ সে কোথায় করিবে?

মদীনায় ইসলাম তাহার স্বাধীনতার উৎস লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়াছিল যে, ইসলাম তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা অন্য ধর্মের নাগরিকদের উপর ইসলাম বলপূর্বক চাপাইয়া দিবে না। সহাবস্থান বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলকে নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিবে। প্রথম দিন হইতেই ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত উদার নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারে আজও ইসলামকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। আজও লোকদের ধারণা– ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী শাসনে অমুসলিমদের গলা কাটিয়া জবরদস্তি তাহাদের মুসলমান করা হয়।

উল্লিখিত চুক্তিটি শুধু দেশ রক্ষা শান্তি রক্ষা এবং মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য রাজনৈতিক চুক্তি ছিল।

মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় ধনে-জনে, শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রবল ছিল এবং এই সম্প্রদায় ছিল মুসলমানদের ঘোর শত্রু। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের শক্তিশালী হইতে হইলে নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মদীনায় মুসলমানদের দুইটি সম্প্রদায় ছিল– আনসার তথা মদীনার অধিবাসী মুসলমান আর মোহাজের তথা বহিরাগত মুসলমান। এই দুই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে পরস্পর তিল পরিমাণ বিভেদ সৃষ্টি হইলেই মদীনায় মুসলমানদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে চুরমার হইয়া যাইত, মদীনায় মুসলমানদের প্রভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না; বরং চিরকাল ইহুদীদের প্রভাবতলে থাকিতে হইত। আর ইহুদীদের ন্যায় শত্রুদের বেষ্টনে থাকায় মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল প্রকট। তাই নবী (সঃ) মুসলমান শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবন্ধন সৃষ্টির জন্য উভয় শ্রেণীকে আনুষ্ঠানিকরূপে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থাকেই আরবী ভাষায় "মোআখাত" বলা হয়, যাহার অর্থ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন।

এই ভ্রাতৃত বন্ধন দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ত সৃষ্টি হইলই, এতদ্ভিন্ন ছিন্নমূল সর্বহারা বহিরাগত মুসলমানদের আশ্রয় লাভেরও বিশেষ সুব্যবস্থা হইল।

আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন (পৃঃ ৫৩৩–৫৬১)

মক্কায় সর্বস্ব ত্যাগ করত হিজরত করিয়া মদীনায় আগমনকারী নিঃস্ব মুসলমানদের জন্য এক একজন মদীনাবাসী মুসলমান তথা আনসারের সঙ্গে এক একজন মোহাজেরের "মোআখাত–ভাই-বন্ধী" বা বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদা এক মজলিসে ৪৫ জন আনসারের সঙ্গে ৪৫ জন মোহাজেরের ভাই

বন্ধী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত হযরত (সঃ) এই মহান কার্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। (আসাহহুস সিয়ার, ১১০)। আনসার তথা মদীনাবাসী মুসলমানগণ এই ভাই-বন্ধীর এমন মর্যাদা দান করিয়াছিলেন যাহার নজির কোন জাতির ইতিহাসে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৭ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের গৃহে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের কাজ করিয়াছিলেন।।

আনসারগণের চরম সহানুভূতি

১৭১৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৩৪) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভাই-বন্ধী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর) আনসারগণ হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাদের এবং মোহাজের ভাইদের মধ্যে আমাদের সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিন। হযরত (সঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন। অতপর তাঁহারা বলিলেন, তবে মোহাজের ভাইগণ আমাদের জায়গা-জমিতে কাজ করিবেন, সে সূত্রে তাঁহারা উহার উৎপন্নে আমাদের শরীক হইবেন। ইহাতে সকলেই সম্মতি দান করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আনসারগণ কর্তৃক মোহাজেরগণের প্রতি চরম সহানুভূতির অসংখ্য উপমা এবং ইতিহাস হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছে একটি ঘটনা রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজের এবং সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) আনসারী– এই দুই জনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। সেমতে সা'দ (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব করিলেন, আমি একজন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, আপনি আমার ভ্রাতা; সেই হিসাবে আমার ধন-সম্পদের অর্ধভাগ আমি আপনাকে দিয়া দিলাম।

এমনকি প্রবাসী বিদেশী মানুষ হিসাবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজেরের নিকট কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে সম্মত হইবে না আশঙ্কায় সা'দ (রাঃ) এই প্রস্তাবও করিলেন যে, আমার দুই স্ত্রী আছে (তখন পর্দার মাসআলা না থাকায়) আপনি উভয়কে দেখিয়া যাহাকে পছন্দ করিবেন আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব; আপনি বিবাহ করিয়া নিবেন।

ঐরূপ দ্বিতীয় খণ্ড ১১৫৮ নং হাদীছেও বর্ণিত আছে, বাহরাইন এলাকা জয় হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইসলামের জন্য কর্মতৎপরতায় আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ আনসারগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এই এলাকার পতিত জমিগুলি তোমাদের নামে লিখিয়া দেই। আনসারগণ উত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের মোহাজের ভাইগণকে ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন।

পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তাআলা আনসারগণের চরম উদারতার বর্ণনায় আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

অর্থ ঃ "অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আনসারগণ নিজেরা না খাইয়া অন্যকে অগ্রগণ্য করিয়া থাকে, অন্যের অভাব মিটাইয়া থাকে।"

এই আয়াত যেই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছিল তাহা অত্যন্তই কৌতূহলজনক। একদা এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নবীজীর (সঃ) নিকট উপস্থিত হইল। নবী (সঃ) প্রথমে নিজ গৃহিণীদের নিকট খোঁজ নিলেন; সংবাদ আসিল, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ক্ষুধার্তের মেহমানীর জন্য কে প্রস্তুত আছে। একজন আনসারী ছাহাবী নিবেদন করিলেন, আমি আছি। অতিথিকে নিয়া তিনি গৃহে গেলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অতিথির সেবা উত্তমরূপে করিও। স্ত্রী বলিলেন, শিশু সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য

ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গৃহের এই সামান্য খাদ্য নিজেরা কেহ না খাইয়া অতিথিকে সম্পূর্ণ খাওয়াইবার এক অভিনব কৌশল করিলেন। শিশু সন্তানদের ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেন। ঐ সময় পর্দার মাসআলা ছিল না আরবের প্রথানুসারে গৃহের সকলকে অতিথির সহিত বসিয়া একই পাত্রে খাইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধানে স্ত্রী স্বামীর পরামর্শানুযায়ী ছল করিয়া গৃহের প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন। অতপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অতিথির সঙ্গে খাইতে বসিয়া গেলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন তাঁহারাও খাইতেছেন। প্রকারান্তরে তাঁহারা এক লোকমাও খাইলেন না– সুকৌশলে সম্পূর্ণ খাদ্যটুকু অতিথিকে খাওয়াইয়া নিজেরা উপবাসে রাত্র কাটাইলেন। তাঁহাদের এই অতুলনীয় মহানুভবতা লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত আয়াত নাযিল হইল।

আত্মনির্ভরশীলতায় মোহাজেরগণের দৃঢ়তা

আনসারগণ এইভাবে অসাধারণ উদারতা মহানুভবতা দেখাইতেছিলেন কিন্তু মোহাজেরগণ ইহাকে সুযোগরূপে কখনও গ্রহণ করেন নাই। আনসারগণের মহানুভবতায় একান্ত কৃতজ্ঞ থাকিয়াও মোহাজেরগণ কায়িক পরিশ্রম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের জীবিকা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতেন।

১৭১৭ নং হাদীছে দেখিতে পাইয়াছেন, আনসারগণ নিজেদের সম্পত্তি মোহাজেরগণকে ভ্রাতা হিসাবে বন্টন করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মোহাজেরগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে বর্গা প্রথায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তদ্রূপ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছের ঘটনায়ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজের সা'দ (রাঃ) আনসারীর মহানুভবতার প্রস্তাব সম্পত্তি ও স্ত্রী বন্টন করিয়া নেওয়ার প্রস্তাবকে ধন্যবাদের সহিত এড়াইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন– ভাই! আমাকে বাজার দেখাইয়া দিন। তিনি বাজারে যাইয়া ব্যবসা দ্বারা প্রতিদিন সামান্য সামান্য উপার্জন করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই বিবাহ করিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাকে ওলীমা খাওয়াইবার পরামর্শ দিলেন; তাহা করিতেও তিনি সক্ষম হইলেন। এমনকি ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি কালে বহু ধনের অধিপতি হইয়াছিলেন।

আয়েশা (রাঃ)-কে গৃহে আনয়ন

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত বিবাহের ইজাব-কবুল হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় বিবাহের শুধু ইজাব-কবুলই হইয়াছিল। আয়েশা (রাঃ)-কে নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে আনিয়াছিলেন না। তখন তাঁহার বয়সও অনেক কম ছিল– মাত্র ছয় বৎসর। মদীনায় হিজরত করিয়া আসার ৭ বা ৮ মাস পরে নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নিজ গৃহে আনিলেন; তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। ১৭৯৬ নং হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আযানের প্রবর্তন

মক্কার সুদীর্ঘ জীবনে নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ মনের সাধ মিটাইয়া নামায পড়িতে পারিতেন না। মসজিদে সমবেত হইয়া জামাতে নামায আদায় করার পূর্ণ সুযোগ ছিলই না। মদীনায় সেই সব বাধা-বিপত্তি নাই; মুসলমাগণ তাঁহাদের মা'বুদের সর্বপ্রথম এবাদত নামায মনের সাধ মিটাইয়া আদায় করার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। জামাতের সহিত নামায আদায় করার জন্য মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমার নামায মুসলমানগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে সমবেতভাবে জামাতের সহিত